রকিব হাসান
রত্নদানো
তিন গোয়েন্দা
কিশোর থ্রিলার

ISBN 984-16-1274-7

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: প্রকাশকের

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

রচনা: বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: sebaprok@citechco.net
Web Site: www.ancbooks.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

সেবা প্রকাশনী

ঊনপঞ্চাশ টাকা

রত্নদানো

প্রথম প্রকাশঃ আগস্ট, ১৯৮৬

'রামধনু রত্নহার চুরি করা যায় কিনা ভাবছি!' আপনমনেই বলল কিশোর পাশা।

সোলডারিং আয়রনটা মুসার হাত থেকে প্রায় খসে পড়ে যাওয়ার জোগাড় হল। রেডিওর তার ঝালাই বাদ দিয়ে ফিরে তাকাল সে। তিন গোয়েন্দার কার্ড শেষ হয়ে এসেছে, আবার ছাপা দরকার, কম্পোজ করছে রবিন, তাও হাত থেমে গেল।

'কী!' চোখ বড় হয়ে গেছে গোয়েন্দা সহকারীর।

'বলছি, রামধনু রত্নহারটা চুরি করা যায় কিনা!' আবার বলল গোয়েন্দাপ্রধান।

'ধর যদি আমরা চোর হতাম?'

'যা নই সেটা নিয়ে ভাবতে যাব কেন? চুরি করা অন্যায়।'

'তা ঠিক!' হাতের খবরের কাগজে বিশেষ ফিচারটার দিকে আবার তাকাল কিশোর।

হাতের স্টিকটা নামিয়ে রেখে মুখ তুলল রবিন। 'কিশোর, রামধনু রত্নহার! কিসের বাংলা করলে?'

'রেইনবো জুয়েলস।'

'পিটারসন মিউজিয়মের নেকলেসটা?'

'হ্যাঁ।'

গত রাতেই নেকলেসটার কথা শুনেছে রবিন, তার বাবা বাসায় আলোচনা করছিলেন।

'পিটারসন মিউজিয়ম। নেকলেস! কি বলছ তোমরা?' কিছুই বুঝতে পারছে না মুসা।

'কোন দেশে বাস কর? খোঁজখবর রাখ কিছু!' বিদ্যে জাহির করার সুযোগ পেয়ে গেছে নথি। 'মিউজিয়মটা হলিউডে, একটা পাহাড়ের চূড়ায় পুরানো একটা বাড়ি, মালিক ছিলেন এক মস্ত ধনী লোক, হিরাম পিটারসন। মিউজিয়মের জন্যে বাড়িটা দান করে দিয়েছেন তিনি।'

'বর্তমানে ওখানে একটা প্রদর্শনী হচ্ছে,' বলল কিশোর। 'রত্ন প্রদর্শনী। এর ব্যবস্থা করেছে জাপানের মস্ত বড় এক জুয়েলারি কোম্পানি, সুকিমিচি জুয়েলারস। আমেরিকার সব বড় বড় শহর ঘুরে ঘুরে প্রদর্শনী করবে ওরা। এটা আসলে এক ধরনের বিজ্ঞাপন। এদেশে অলঙ্কারের বড় মার্কেট রয়েছে। ওই কোম্পানির

বিশেষত্ব হল মুক্তোর তৈরি অলঙ্কার। অনেক পুরানো দামি জিনিসও আছে ওদের স্টকে। তারই একটা রেইনবো জুয়েলস, সোনার তৈরি সাতনরি হার, হীরা-চুনি-পান্নাখচিত। নাড়া লাগলেই রামধনুর সাতরঙ যেন ছিটকে বেরোয় পাথরগুলো থেকে। দাম অনেক।'

'আরও একটা দামি জিনিস এনেছে ওরা,' কিশোরের কথার পিঠে বলে উঠল রবিন। 'একটা সোনার বেল্ট। অনেকগুলো পান্না বসানো আছে ওতে। জিনিসটার ওজন পনেরো পাউণ্ড। ওটার মালিক ছিলেন নাকি জাপানের প্রাচীন এক সম্রাট।'

'তোমার মাথা খারাপ হয়েছে, কিশোর!' বিস্ময় কাটেনি এখনও মুসার। 'এত দামি জিনিস চুরি করার সাধ্য করেও নেই! নিশ্চয়ই কড়া পাহারা দিয়ে রাখা হয়েছে জিনিসগুলো, ব্যাঙ্কের ভল্টের মত...'

'তার চেয়েও কড়া পাহারা রয়েছে। জিনিসগুলো যে-ঘরে রাখা হয়েছে, ওখানে পালা করে সারাক্ষণ পাহারা দেয় পিস্তলধারী প্রহরী। মানুষের চোখকে পুরোপুরি বিশ্বাস নেই, তাই বসানো হয়েছে একটা ক্লোজড-সার্কিট টেলিভিশন-ক্যামেরা। তাতে যদি ক্যামেরা ঠিকমত কাজ না করে? সেজন্যে অদৃশ্য আলোকরশ্মির ব্যবস্থা হয়েছে। যে-কোন একটা রশ্মি কোনভাবে বাধা পেলেই চালু হয়ে যাবে অ্যালার্ম সিস্টেম। কাচের বাক্সে রাখা হয়েছে রেইনবো জুয়েলস আর সোনার বেল্ট। ওই বাক্সেও রয়েছে অ্যালার্ম ব্যবস্থা। বাক্সের ভেতর কেউ হাত দিলেই বেজে উঠবে বেল। কারেন্ট ফেল করলেও অসুবিধে নেই, ব্যাটারি কানেকশন রয়েছে প্রতিটি সিসটেমের সঙ্গে।'

'ওই তো, যা বলেছিলাম,' বলল মুসা। 'কেউ চুরি করতে পারবে না জিনিসগুলো।'

'হ্যাঁ, বড় রকমের চ্যালেঞ্জ একটা,' মাথা নাড়ল কিশোর।

'চ্যালেঞ্জ!' ভুরু কুঁচকে গেছে রবিনের। 'আমরা কি চুরি করতে যাচ্ছি নাকি ওগুলো!'

'করার মত কোন কাজ এখন আমাদের হাতে নেই,' সহজ গলায় বলল কিশোর। 'মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফারও অনেকদিন কোন কাজ দিতে পারছেন না। সময় তো কাটাতে হবে আমাদের। ব্রেনটা চালু রাখতে হবে। জিনিসগুলো চুরি করার একটা উপায় নিশ্চয় আছে, সেটা যদি জানতে পারি, ভবিষ্যতে অনেক কঠিন রত্ন-ডাকাতির কেস সহজেই সমাধান করতে পারব আমরা।'

'অযথা সময় নষ্ট!' ঠোঁট ওল্টাল মুসা। 'চুরিচামারির কথা ভাবার চেয়ে চল গিয়ে ডাইভিং প্র্যাকটিস করি, পুরোপুরি রপ্ত হয়নি এখনও আমাদের।'

'আমিও তাই বলি,' মুসার পক্ষ নিল রবিন। 'বাবা কথা দিয়েছে, ডাইভিংটা ভালমত শিখে নিলে আমাদেরকে মেক্সিকোতে নিয়ে যাবে। উপসাগরে সাঁতার কাটতে পারব, পানির তলায় ওখানে বড় বড় জ্যান্ত চিংড়ি পাওয়া যায়।

অক্টোপাসের বাচ্চা…'

'চুপ চুপ, আর বল না, রবিন!' জোরে জোরে হাত নাড়ল মুসা। 'এখুনি ওখানে চলে যেতে ইচ্ছে করছে আমার!'

'খবরের কাগজে লিখেছে।' দুই সহকারীর কথা যেন শুনতেই পায়নি কিশোর, 'আজকে মিউজিয়মে চিলড্রেনস ডে। আঠারো বছরের নিচের যে-কোন কিশোর হাফ-টিকেটে ঢুকতে পারবে আজ। ইউনিফর্ম পরে যে বয়স্কাউটরা যাবে, তাদের পয়সাই লাগবে না।'

'আমাদের ইউনিফর্ম নেই,' তাড়াতাড়ি বলল মুসা। 'তারমানে আমরা বাদ।'

'গত হপ্তায় চাচাকে সাহায্য করেছি আমরা, ইয়ার্ডের কাজ করে বেশ কিছু কামিয়েছি,' মনে করিয়ে দিল কিশোর। 'হাফ কেন, ফুল টিকেট কিনে প্রদর্শনী দেখার ক্ষমতা এখন আমাদের আছে। ভাবছি, আজই কেন চলে যাই না? আর কিছু না হোক, রেইনবো জুয়েলস দেখার সৌভাগ্য তো হবে। আসল মুক্তো আর হীরা-চুনি-পান্না দেখতে পারব। ভবিষ্যতে কাজে লাগবে এই অভিজ্ঞতা।'

'মুসা,' গোয়েন্দা সহকারীর দিকে চেয়ে বলল নথি। 'ওকে ভোটে হারাতে পারব আমরা, কি বল?'

'নিশ্চয় পারব!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'পাথর দেখে কি হবে? জানিই তো কি রঙের হবে পাথরগুলো, কেমন হবে। ওগুলো দেখে কি করব?'

'মাইক্রোস্কোপের তলায় রেখে দেখলে…,'

'…দেখলে কি হবে?' কিশোরকে থামিয়ে দিয়ে জানতে চাইল রবিন। 'বড় দেখাবে, এই তো?'

'ক্রিকেট বল, নাহয় ফুটবলের মতই দেখাবে,' হাতের আঙুল ওপরের দিকে বাঁকা করে নাড়ল মুসা। 'আমাদের কি? হ্যাঁ, একটাই কাজ করা যেতে পারে ওই পাথর দিয়ে, গুলতিতে লাগিয়ে ছুঁড়ে পাখি মারা যেতে পারে।…আরে হ্যাঁ হ্যাঁ, এই তো আবিষ্কার করে ফেলেছি, কি করে চুরি করা যায়! গুলতির সাহায্যে হারটা জানালা দিয়ে ছুঁড়ে মারলেই হল! বাইরে চোরের সঙ্গী বড় ঝুড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে, লুফে নেবে ঝুড়িতে! তারপর ছুটে পালাবে! বা বা, এই তো একটা উপায় বের করে ফেলেছি! পানির মত সহজ কাজ!'

'চমৎকার বুদ্ধি!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল রবিন।

কয়েক মুহূর্ত চিন্তায় মগ্ন রইল কিশোর। তারপর মাথা নাড়ল ধীরে ধীরে। 'মোটেই চমৎকার নয়। দুটো ফাঁক রয়েছে। ঝুড়িতে নিল যে, সে হয়ত পালাতে পারবে, কিন্তু যে ছুঁড়ল, সে ঘরেই থেকে যাবে তখনও, ধরা পড়বে গার্ডের হাতে। আরেকটা দুর্বলতা হল,' মুসা আর রবিনের দিকে একবার করে তাকাল গোয়েন্দাপ্রধান। 'পিটারসন মিউজিয়মের যে ঘরে রাখা হয়েছে রেইনবো জুয়েলস, ওই ঘর থেকে জানালা দিয়ে ছোঁড়া যাবে না জিনিসটা। কারণ… নাটকীয় ভাবে

চুপ করল সে।

'কারণ?' সামনে ঝুঁকল মুসা।

'হ্যাঁ, কেন ছোঁড়া যাবে না?' মুসার পর পরই প্রশ্ন করল রবিন।

'কারণ, পিটারসন মিউজিয়মে কোন জানালাই নেই,' মুচকে হাসল কিশোর। 'চল রওনা হয়ে যাই, দেরি না করে।'

দুই

ঘন্টাখানেক পর ছোট পাহাড়টার গোড়ায় এসে পৌঁছল তিন গোয়েন্দা। পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে আছে পিটারসন মিউজিয়ম। গ্রিফিথ পার্ক থেকে বেরিয়ে একটা পথ চলে গেছে উপত্যকা ধরে। এখান দিয়ে প্রায়ই পার্কে পিকনিক করতে যায় লোকে, বিশেষ করে ছেলেমেয়েরাই বেশি যায়। বিরাট বাড়িটার দু'দিকে দুটো শাখা যেন ঠেলে বেরিয়েছে, দুটোরই ছাতের জায়গায় রয়েছে বিশাল দুটো গম্বুজ। বাড়ির সামনে পেছনের চাল সবুজ ঘাসে ছাওয়া। ঘুরে ঘুরে একটা পথ উঠে গেছে বাড়ির পেছনে, আরেকটা পথ নেমে এসেছে; একটা ওঠার, আরেকটা নামার জন্যে।

মোটর কার আর স্টেশন ওয়াগনের সারি ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছে মিউজিয়মের দিকে। পথের এক পাশ ধরে উঠতে শুরু করল তিন গোয়েন্দা। ঠাসাঠাসি করে গাড়ি রাখা হয়েছে পার্কিং লট-এ, আরও এসে ঢুকছে। ঢোকার সময় তো ঢুকেছে, বেরোনর সময় বুঝবে ঠেলা, ভাবল কিশোর। চারদিকে ভিড়, বেশির ভাগই বাচ্চা ছেলেমেয়ে। নীল ইউনিফর্ম পরা কাব স্কাউটরা বিশৃঙ্খল ভাবে ছোটাছুটি করছে এদিক ওদিক, সামলাতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে তাদের ডেন মাদার (পরিচালিকা)। গার্ল স্কাউটেরা ছোটাছুটি বিশেষ করছে না, কিন্তু তাদের কলরবে কান ঝালাপালা। কে যে কি বলছে, বোঝার উপায় নেই। বাচ্চা ব্রাউনিদের কাছাকাছিই রয়েছে কয়েকজন লম্বা বয়স্কাউট, বেল্টে গোঁজা ছোট্ট কুঠার, হাতে ক্যানভাসের ব্যাগ।

'জায়গাটা ভালমত দেখে নেয়া দরকার,' সহকারীদেরকে বলল কিশোর। 'আগে মিউজিয়মের বাইরেটা দেখব।'

বাড়ির পেছনে এক চক্কর দিল তিনজনে। একসময় অনেক জানালা ছিল, কিন্তু এখন বেশির ভাগই বন্ধ করে দেয়া হয়েছে ইঁট গেঁথে। নিচের তলা আর গম্বুজওয়ালা ঘরগুলোতে একটা জানালাও নেই, সব বুজিয়ে দেয়া হয়েছে। গুলতির সাহায্যে কেন অলঙ্কার চুরি করা যাবে না, বুঝতে পারছে এখন রবিন আর মুসা। জানালাই নেই, ছুঁড়বে কোন্ পথ দিয়ে? গম্বুজওয়ালা একটা ঘরের দিকে এতই মনোযোগ তার, ডেন মাদারের সঙ্গে কয়েকজন কাব স্কাউটকে দেখতেই পেল না, পড়ল গিয়ে একজনের গায়ে। 'আঁউউ!...ইস্স্, সরি!'

ঘাসের ওপর চিত হয়ে পড়েছে একটা ছেলে, রবিনের ধাক্কা খেয়ে। লজ্জিত

হাসি হাসল ছেলেটা, ঝিক করে উঠল একটা সোনার দাঁত। হাত ধরে টেনে তাকে উঠতে সাহায্য করল রবিন। আরেকবার দুঃখ প্রকাশ করল। ডেন মাদারের সঙ্গে অনেকখানি এগিয়ে গেছে অন্য স্কাউটেরা, তাদেরকে ধরতে ছুটল ছেলেটা।

'আরে আরে, দেখ!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।

'কি!' ভুরু কুঁচকাল মুসা, ঠোঁট বাঁকাল। 'কি দেখব! বাড়ির পেছনটা ছাড়া তো আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না!'

'তারগুলো দেখতে পাচ্ছ না? ওই, ওই যে? পোল থেকে নেমে এসেছে, ইলেকট্রিক তার। সবগুলোকে এক করে পাকিয়ে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে একটা গর্তের ভেতর দিয়ে! ওই তো, বাড়িটার এক কোণে! সহজেই কেটে ফেলা যায়!'

'তোমার যা কথা!' বলল রবিন। 'কে কাটতে যাবে?'

'রত্নচোরেরা। তবে ওগুলো কাটলে বড় জোর আলো নেভাতে পারবে, অ্যালার্ম সিস্টেম অকেজো হবে না। সে যা-ই হোক, এটা একটা দুর্বলতা!'

বাড়ির সামনে-পেছনে ঘোরা শেষ করল তিন গোয়েন্দা। সামনে দিয়ে ভেতরে ঢোকার গেটের দিকে এগোল। ওরা ইউনিফর্ম পরে আসেনি, কাজেই টিকেট কিনতে হল। পঁচিশ সেন্ট করে হাফ টিকেটের দাম।

গেট পেরিয়ে প্যাসেজে এসে ঢুকল তিনজনে।

'তীর চিহ্ন ধরে এগিয়ে যাও,' পথের নির্দেশ দিল একজন গার্ড।

ডান শাখার বিশাল এক হলঘরে এসে ঢুকল তিনজনে। গম্বুজওয়ালা এই ঘরটা প্রায় তিন-তলার সমান উঁচু। দেয়ালের মাঝামাঝি উচ্চতায় অর্ধেকটা ঘিরে রয়েছে ব্যালকনি। 'বন্ধ' নির্দেশিকা ঝুলছে ওখানে।

কারুকাজ করা সুদৃশ কাঠের ফ্রেমে বাঁধাই দামি দামি ছবি ঝুলছে দেয়ালে। ওগুলো মিউজিয়মের সম্পত্তি। ছবির প্রতি তেমন আকর্ষণ দেখাল না তিন গোয়েন্দা, তারা এসেছে রত্ন আর অলঙ্কার দেখতে।

ছবিগুলোর পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল কিশোর। 'ছবিগুলো কিভাবে ঝোলানো হয়েছে, লক্ষ্য করেছ? দেয়ালের ওপরের দিকের খাঁজ থেকে আটকানর ব্যবস্থা করা হয়েছে। আগে কিন্তু এভাবে ছবি ঝোলানো হত না। সিলিঙে হুক লাগিয়ে লম্বা শেকল দিয়ে ঝোলানো হত। দেখেছ, হুকগুলো এখনও আছে?'

একবার ওপরে তাকিয়ে দেখল মুসা, কিন্তু গুরুত্ব দিল না। প্রায় দরজা-আকারের বড় বড় জানালাগুলোর দিকে তার মন। 'জানালা বন্ধ করে দিল কেন ওরা?'

'দেয়ালে বেশি করে জায়গা করেছে, আরও বেশি ছবি ঝোলানর জন্যে,' বলল কিশোর। 'এটা একটা কারণ। তবে আসল কারণ বোধহয় ভাল এয়ারকণ্ডিশনিঙের জন্যে। দামি দামি ছবি, তাপমাত্রার পরিবর্তনে ক্ষতি হতে পারে, তাই সব সময়

একই রকম উত্তাপ রাখার জন্যে এই ব্যবস্থা হয়েছে।'

ধীরে ধীরে পুরো ঘরে চক্কর দিল ওরা, তারপর ভিড়ের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির পেছন দিকের আরেকটা বড় হলঘরে এসে ঢুকল। তারপর চলে এল বাঁ-শাখার গম্বুজওয়ালা ঘরটায়। এখানেই রত্ন প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছে। ডান শাখার ঘরটার মত এখানেও দেয়ালের মাঝামাঝি ব্যালকনি রয়েছে। ব্যালকনিতে ওঠার সিঁড়ির মাথা দড়ি আটকে রুদ্ধ করা হয়েছে।

ঘরের ঠিক কেন্দ্রে রয়েছে রেইনবো জুয়েলস। কাচের বাক্সটা ঘিরে রয়েছে খুঁটি, ওগুলোতে বেঁধে রঙিন মখমলের দড়ির ঘের দেয়া হয়েছে। ঘেরের এপাশ থেকে হাত বাড়িয়ে বাক্সটার নাগাল পাওয়া যায় না।

'সুন্দর ব্যবস্থা,' সারির মধ্যে থেকে চলতে চলতে বলল কিশোর। 'হঠাৎ গিয়ে ঘুসি মেরে বাক্স ভেঙে হারটা তুলে নিতে পারবে না চোর।'

এক জায়গায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে কিছু দেখার উপায় নেই, এত ভিড়। সারি চলছে ধীরে ধীরে, তারই মাঝে থেকে চলতে চলতে যতখানি দেখে নেয়া যায়। বড় একটা হীরা—নীল আলো ছড়াচ্ছে, মস্ত জোনাকির মত জ্বলে আছে একটা পান্না, জ্বলন্ত কয়লার মত ধক ধক করছে একটা চুনি, আর জ্বলজ্বলে সাদা বিশাল একটা মুক্তা—এই চারটে পাথরই বেশ কায়দা করে বসানো হয়েছে রত্ন হারটাতে। ওগুলোকে ঘিরে ঝকমক করছে ছোটবড় আরও অসংখ্য পাথর। ঠিক নামই রাখা হয়েছে, রামধনু রত্নহার, রামধনুর মতই সাত রঙ বিচ্ছুরিত হচ্ছে পাথরগুলো থেকে।

কাচের বাক্সের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে একজন গার্ড। তাকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল হারটার দাম বিশ লক্ষ আমেরিকান ডলার। দাম শুনে 'হু-ই-ই-ই' করে উঠল এক গার্ল স্কাউট।

এক দিকের দেয়ালের কাছে চলে এল তিন গোয়েন্দা। ব্যালকনির ঠিক নিচেই আরেকটা কাচের বাক্সে রাখা হয়েছে ফুট তিনেক লম্বা সোনার বেল্টটা। অনেকগুলো চারকোণা সোনার টুকরো গেঁথে তৈরি হয়েছে বেল্ট। প্রতিটি টুকরোর মাঝখানে বসানো একটা করে চৌকোণা পান্না, ধারগুলোতে বসানো হয়েছে মুক্তা। দুই মাথার বকলেসে রয়েছে হীরা এবং চুনি। বেল্টের আকার দেখেই বোঝা যায়, এটা যিনি পরতেন, বিশালদেহী মানুষ ছিলেন তিনি।

'সম্রাটের সোনার বেল্ট এটার নাম,' বেল্টের বাক্সের কাছে দাঁড়ানো এক গার্ড বলল। 'জিনিসটা প্রায় হাজার বছরের পুরানো। ওজন পনেরো পাউণ্ডের মত। খুবই দামি জিনিস, কিন্তু আসল দাম কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে এর ঐতিহাসিক মূল্য।'

আরও কিছুক্ষণ বেল্টটা দেখার ইচ্ছে ছিল তিন গোয়েন্দার, কিন্তু পেছনের চাপে বাধ্য হয়ে সরে আসতে হল। অসংখ্য কাচের বাক্সে সাজিয়ে রাখা হয়েছে

রত্নদানো

আরও অনেক মূল্যবান জিনিস, তার প্রায় সবই সুকিমিচি জুয়েলারস-এর তৈরি। আঠা দিয়ে মুক্তা আর কাচ জুড়ে তৈরি হয়েছে হাঁস, ঘুঘুপাখি, মাছ, হরিণ আর অন্যান্য অনেক জীবজন্তুর প্রতিকৃতি। ছেলেরা চুপচাপ মুগ্ধ চোখে দেখছে, কিন্তু মেয়েরা চুপ করে থাকতে পারছে না। চারদিক থেকে কেবল তাদের হুঁইই-হাঁইই, ইস্‌স্‌-আস্‌স্‌ শোনা যাচ্ছে।

প্রায় ভরে গেছে এখন ঘরটা। কথা বলার জন্যে খালি একটু জায়গা দেখে সরে এল তিন গোয়েন্দা।

'কত গার্ড দেখেছ?' বলল কিশোর। 'দিনের বেলা এখানে চুরি করা সম্ভব নয়। করলে রাতে করতে হবে। কিন্তু কিভাবে? ঢুকবে কি করে? অ্যালার্ম ফাঁকি দিয়ে বাক্স ভাঙবে কি করে?' মাথা নাড়ল সে আপনমনেই। 'আমার মনে হয় না চুরি করতে পারবে, যদি না...'

'হুপ্‌প্‌!' কিশোরের গায়ে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল লোকটা। হাতঘড়ির দিকে চেয়ে পিছিয়ে এসেছে, আর কোনদিকেই নজর ছিল না।

'আরে, মিস্টার মার্চ?' বলে উঠল কিশোর।

'কে!' ভুরু কুঁচকে তাকাল লোকটা।

'আরে, আমাকে চিনতে পারছেন না? আমি কিশোর, কিশোর পাশা। টেলিভিশনে কমিকে অভিনয় করতাম, মনে নেই? আমরা বাচ্চারা যত গণ্ডগোল বাধাতাম, আপনি তার খেসারত দিতেন, মনে পড়ছে?'

'কি কিশোর পাশা! ও ইয়ে...হ্যাঁ হ্যাঁ!' চেঁচিয়ে উঠল লোকটা। 'কিন্তু এখন তো কথা বলার সময় নেই আমার, অভিনয় করতে হবে।'

'অভিনয়?'

'দেখ, কি করি,' হাসল মিস্টার মার্চ। 'মজা দেখ। ওই যে, একটা গার্ড।' গলা চড়িয়ে ডাকল, 'গার্ড! গার্ড!'

ঘুরল ইউনিফর্ম পরা গার্ড। থমথমে চেহারা। 'কি হয়েছে?' ভারি কণ্ঠ।

টলে উঠল মার্চ। 'আমার...আমার মাথা ঘুরছে!...পানি! পানি!' পকেট থেকে রুমাল বের করে কাঁপা কাঁপা হাতে কপালের ঘাম মুছল সে। হাত কাঁপছে বলেই বোধহয়, রুমালের ভাঁজ থেকে খুট করে কিছু একটা মেঝেতে পড়ে গেল। লাল একটা পাথর, পান্নার মত দেখতে। 'আহ্‌হা!' চেহারায় শঙ্কা ফুটল অভিনেতার।

দুই লাফে কাছে চলে এল গার্ড। 'কোত্থেকে চুরি করেছ এটা!' গর্জে উঠল সে। 'এস, এদিকে এস!' মার্চের কলার চেপে ধরে টানল লোকটা।

হ্যাঁচকা টান দিয়ে কলার ছাড়িয়ে নিল মার্চ, জোরে এক ধাক্কা মারল গার্ডের বুকে।

আর দ্বিধা করল না গার্ড। হুইসেল বাজাল। বদ্ধ ঘরের বাতাস যেন চিরে দিল বাঁশির তীক্ষ্ণ শব্দ। জমে গেল যেন ঘরের প্রতিটি লোক। সব কটা চোখ প্রায় একই

সঙ্গে ঘুরে গেছে গার্ড আর মার্চের দিকে। দেখতে দেখতে ছুটে এসে মার্চকে ঘিরে ফেলল গার্ডেরা। অপরাধী একটা ভঙ্গি করে দাঁড়িয়ে আছে অভিনেতা।

'এই যে মিস্টার...' শুরু করল হেড গার্ড। কিন্তু তার কথা শেষ হল না, তার আগেই গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে গেল পুরো ঘরটা।

এক সেকেণ্ড নীরবতা। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল একটা উত্তেজিত কণ্ঠ, 'আলো! আলো জ্বেলে দাও!'

'হারের বাক্সটার কাছে চলে যাও দু'জন!' শোনা গেল হেড গার্ডের আদেশ। 'বিল, ডিক, তোমরা গিয়ে দরজা আটকাও। খবরদার, কেউ যেন বেরোতে না পারে!'

এরপর শুরু হল হট্টগোল। যার যেভাবে খুশি চেঁচাচ্ছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের অনেকে ভয়ে হাউমাউ জুড়ে দিয়েছে, চেঁচিয়ে, বুঝিয়ে তাদেরকে শান্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে মায়েরা।

'চীফ!' চেঁচিয়ে উঠল এক গার্ড। 'ছেলেপিলেগুলোর জন্যে এগোতে পারছি না! বাক্সটার কাছে যাওয়া যাচ্ছে না!'

'যেভাবেই হোক, যাও!' আবার বলল হেড গার্ড। 'ডাকাত! ডাকাত পড়েছে!'

ঠিক এই সময় ঝন ঝন করে ভাঙল কাচ। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে উঠল যেন অ্যালার্ম বেল। তারই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চেঁচিয়ে চলল দর্শকরা। অন্ধকারের মধ্যে কে কত জোরে চেঁচাতে পারে তারই প্রতিযোগিতা চলেছে যেন।

'রত্নহার!' কিশোরের কানের কাছে মুখ এনে বলল মুসা। 'হারটা চুরি করার তালে আছে কেউ!'

'তাই তো মনে হচ্ছে,' কিশোরের কণ্ঠ শুনেই বোঝা গেল, ব্যাপারটা খুব উপভোগ করছে সে। 'ভেবেচিন্তে প্ল্যান করেই এসেছে ডাকাতেরা।...চল, সামনের দরজার কাছে চলে যাই। ব্যাটারা ওদিক দিয়েই হয়ত বেরোবে। চল চল।'

'পেছনেও দরজা আছে,' বলল রবিন।

'তা আছে। কিন্তু এক সঙ্গে দু'দিকে দেখতে পারব না। চল, সামনের দিকেই যাই।'

দু'হাতে বাচ্চাদেরকে ঠেলে সরিয়ে দরজার দিকে এগোলো কিশোর। তাকে সাহায্য করল মুসা। ভিড়ের মধ্যে কোনমতে পথ করে এগোল তিন গোয়েন্দা।

দরজার কাছে যেতে পারল না ওরা। গার্ডেরা কাউকে বেরোতে দিচ্ছে না, ফলে দরজার কাছে ঠাসাঠাসি হয়ে আছে লোকজন। এ ওকে ঠেলা মারছে, সে তাকে গুঁতো দিচ্ছে। পাগল হয়ে উঠেছে যেন সবাই। বিপজ্জনক পরিস্থিতি। এখন কোনভাবে এক-আধটা বাচ্চা পড়ে গেলে জনতার পায়ের চাপেই চ্যাপ্টা হয়ে যাবে।

অ্যালার্ম আর হট্টগোল ছাপিয়ে শোনা গেল একটা কণ্ঠ; কথায় জাপানী টান।

থামিয়ে দেয়া হল বেল। বোধহয় ইমার্জেন্সী সুইচ অফ করে ব্যাটারি কানেকশন কেটে দেয়া হয়েছে। আবার শোনা গেল সেই কণ্ঠে আদেশ, 'গার্ডস! জলদি বাইরে চলে যাও!' লোককে হল থেকে বেরোতে দাও। কিন্তু সাবধান! এরিয়ার বাইরে যেন যেতে না পারে কেউ! সবাইকে সার্চ করে তবে ছাড়বে!'

দরজার কাছ থেকে বোধহয় সরে দাঁড়াল গার্ডেরা। কারণ, অন্ধকারেই বুঝতে পারল কিশোর, ঢেউ খেলে গেল যেন জনতার মাঝে। নড়তে শুরু করেছে সবাই একদিকে, বেরিয়ে যাচ্ছে। মুসা আর রবিনকে নিয়ে তাদের মাঝে ঢুকে গেল সে।

তিন গোয়েন্দাকে যেন ছিটকে বের করে নিয়ে এল জনতার স্রোত। দেয়াল ঘেরা বড় একটা লনে বেরিয়ে এসেছে ওরা। আশেপাশে অসংখ্য গার্ড, দর্শকদের কাউকেই লনের বাইরে যেতে দিচ্ছে না। বাচ্চা আর মহিলাদের শান্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে কয়েকজন। পুলিশের সাইরেন শোনা গেল। খানিক পরেই লনের গেট দিয়ে ভেতরে এসে ঢুকল কয়েকটা পুলিশের গাড়ি আর হাফট্রাক। লাফ দিয়ে নেমে এল সশস্ত্র পুলিশ।

শুরু হল তল্লাশি। বয়স্কাউট আর গার্ল গাইডরা পুলিশকে সাহায্য করতে লাগল।

দ্রুত চলল তল্লাশি। সারি দিয়ে গেটের দিকে এগোচ্ছে দর্শকরা, যাদেরকে তল্লাশি করা হয়ে যাচ্ছে তারা বেরিয়ে যাচ্ছে। ইচ্ছে করেই রবিন আর মুসাকে নিয়ে পেছনে রইল কিশোর, যাতে তাদের পালা পরে আসে।

মিস্টার মার্চের পালা এল। বিধ্বস্ত চেহারা তার। একজন গার্ডকে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে? ডাকাতি...'

'...এই যে মিস্টার,' মার্চকে দেখেই বলে উঠল হেড গার্ড। 'আপনাকে এখন যেতে দেয়া হবে না। হাত ধরে টেনে অভিনেতাকে পুলিশ ইন্সপেক্টরের কাছে নিয়ে চলল সে।

'কিছু পাওয়া যাবে না ওর কাছে,' নিচু গলায় দুই সঙ্গীকে বলল কিশোর। 'সহজে ছাড়াও পাবে না। জেরার পর জেরা চলবে।...কিন্তু ডাকাত ব্যাটারা পালাল কোন পথে?'

'তাই তো বুঝতে পারছি না!' পুরো লনে চোখ বোলাল মুসা। 'পুরুষ আর তেমন কেউ নেই, খালি মহিলা, আর বাচ্চা! এদের কাউকেই তো ডাকাত মনে হচ্ছে না!'

'হুঁ!' বিড়বিড় করল কিশোর। 'ওদের কাছে কিছু পাওয়া যাবে না...'

হুড়মুড় করে এই সময় মিউজিয়ম থেকে বেরিয়ে এলেন এক ছোটখাট জাপানী ভদ্রলোক, হাতে টর্চ। চেঁচিয়ে গার্ডদেরকে বললেন, 'লোকেরা চলে গেছে, না? হায় হায়, গেল বুঝি! রেইনবো জুয়েলস না, নেইনবো জুয়েলস না, বেল্টা নিয়ে গেছে!'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল কিশোরের চোখ। 'অবাক কাণ্ড তো! ব্যাটারা বেল্ট চুরি করতে গেল কেন? হারটা নেয়া অনেক সোজা ছিল! এতবড় জিনিস, লুকাল কোথায়!'

'ওই যে দু'জন বয়স্কাউট,' আঙুল তুলে দেখাল রবিন। 'লম্বু দুটোকে দেখছ না, আমার মনে হয় ওদের কাজ। কুঠার দিয়ে বাড়ি মেরে কাচের বাক্স ভেঙেছে···। বেল্টটা আছে ওদের কাছেই'

'আমার মনে হয় না।' এদিক ওদিক মাথা নাড়ল গোয়েন্দাপ্রধান, ঠোঁট গোল করে শিস দিল। 'গোল্ডেন বেল্ট ওদের কাছে পাওয়া যাবে না।'

কিশোরের কথা ঠিক হল। স্কাউটদেরকেও তল্লাশি করা হল, কিন্তু পাওয়া গেল না সোনার বেল্ট। তাদের ব্যাগে খাবার ছাড়া আর কিছুই নেই, মিউজিয়ম থেকে গ্রিফিথ পার্কে গিয়ে পিকনিকের ইচ্ছে, তাই সঙ্গে খাবার নিয়ে এসেছে। আস্তে আস্তে খালি হয়ে এল লন। তিন গোয়েন্দাকেও তল্লাশি করা হল। এবার বেরিয়ে যেতে পারে ওরা, কিন্তু বেরোল না কিশোর। আরেকবার মিউজিয়মে ঢোকার ইচ্ছে তার।

আর কাউকে তল্লাশি করা বাকি নেই। মিউজিয়মে এখনও আলো জ্বালানর ব্যবস্থা হয়নি। কয়েকটা টর্চ জোগাড় করে অন্ধকার মিউজিয়মে ঢুকল গিয়ে কয়েকজন গার্ড। মুসা আর রবিনকে নিয়ে কিশোরও ঢুকে পড়ল।

যে কাচের বাক্সে বেল্টটা রাখা হয়েছিল, ওটার ওপরের আর এক পাশের কাচ ভেঙে চুরমার। অন্য বাক্সগুলো ঠিকই আছে, বেল্টটা বাদে আর কিছু চুরিও হয়নি।

এই সময় পেছনে চেঁচিয়ে উঠল কেউ, 'আরে, এই যে, ছেলেরা, তোমরা এখানে কি করছ? এখানে কি?'

সেই জাপানী ভদ্রলোক।

'স্যার।' পকেট থেকে কার্ড বের করে বাড়িয়ে ধরল কিশোর, 'আমরা গোয়েন্দা। আপনাদেরকে সাহায্য করতে চাই।'

টর্চের আলোয় কার্ডটা পড়লেন ভদ্রলোক। তারপর মুখ তুলে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে কিশোরের দিকে তাকালেন।

হেসে বলল গোয়েন্দাপ্রধান। 'যে-কোন ধরনের রহস্য সমাধান করতে রাজি আমরা। ভৌতিক রহস্য, চুরি ডাকাতি···'

'পাগল! আমেরিকান ছেলেগুলো সব বদ্ধ পাগল। যত্তোসব!' কার্ডটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন ভদ্রলোক। 'আমি টোহা মুচামারু, সুকিমিচি জুয়েলারস কোম্পানির সিকিউরিটি ইনচার্জ, আমিই ভেবে কুলকিনারা পাচ্ছি না গোল্ডেন বেল্ট কি করে চুরি হল! আর তিনটে বাচ্চা খোকা এসেছে এর সমাধান করতে! হুঁহ!···যাও, খোকারা, বাড়ি যাও। খামোকা গোলমাল কোরো না। বেরোও।' প্রায় ধাক্কা দিয়ে তিন গোয়েন্দাকে মিউজিয়ম থেকে বের করে দিলেন মুচামারু।

তিন

পরদিন খবরের কাগজে বেশ বড়সড় হেডিং দিয়ে ছাপা হল 'গোল্ডেন বেল্ট' চুরির সংবাদ, খুঁটিয়ে পড়ল কিশোর। নতুন কিছু তথ্য জানা গেল। মেকানিক-এর পোশাক পরা একজন লোককে মিউজিয়মের সীমানার ভেতরে ঢুকতে দেখা গেছে, এর কয়েক মিনিট পরেই গাড়িতে করে দ্রুত চলে গেছে লোকটা। যারা দেখেছে, তারা প্রথমে কিছু বুঝতে পারেনি। যে-কোন বাড়িতে যে-কোন সময় বৈদ্যুতিক গোলযোগ ঘটতে পারে, সারানর জন্যে মিস্ত্রি আসতে পারে, এতে অস্বাভাবিক কিছু নেই। নিখুঁত পরিকল্পনা করে চুরি করতে এসেছিল একটা দল, মাপা সময়ে যার যার কাজ করে সরে পড়েছে। কেউ বাইরে থেকে কাজ করেছে, কেউ করেছে ভেতর থেকে। কে ছিল ভেতরে?

পেছনের দরজা দিয়ে কেউ বেরোয়নি। কাগজে লিখেছে, বেরোনর উপায় ছিল না কারণ, পেছনের দরজা এমন ভাবে বন্ধ করা ছিল, ওটা খুলে বোরোনো অসম্ভব। তারমানে চোরও বেরিয়েছে সামনের দরজা দিয়েই। মিউজিয়মের ভেতরে দর্শক যারা যারা ঢুকেছিল, তাদের সবাইকে লনে আটকানো হয়েছে, ভালমত তল্লাশি করা হয়েছে। তাহলে কোনদিক দিয়ে গেল চোর?

কাগজে লিখেছে, মিস্টার টোড মার্চকে জেরা করার পর ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

'এই মিস্টার মার্চের ব্যাপারটাই বুঝতে পারছি না!' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। 'রুমাল থেকে ইচ্ছে করেই একটা লাল পাথর ফেলল! আসল পাথর নয়, নকল, কাচ-টাচের তৈরি হবে।'

হেডকোয়ার্টারে রয়েছে তিন গোয়েন্দা। কিশোরের কথা শেষ হয়নি, বুঝতে পেরে চুপ করে রইল মুসা আর রবিন।

ক্যারাভানের দেয়ালের দিকে চেয়ে ভ্রূকুটি করল কিশোর। 'কোন সন্দেহ নেই, পেশাদার দলের কাজ। প্রতিটি সেকেণ্ড পর্যন্ত মেপে নিয়েছে। নাহ্, কিছু বোঝা যাচ্ছে না! কি করে সোনার বেল্টটা বের করল ওরা?'

'গার্ডদের কেউ হতে পারে!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'নিশ্চয় চোরের সঙ্গে যোগসাজশ রয়েছে! কোন গার্ডকে কিন্তু তল্লাশি করা হয়নি!'

প্রশংসার দৃষ্টিতে বন্ধুর দিকে তাকাল মুসা। 'ঠিক, এটা হতে পারে! কিন্তু হু...আরও একটা সম্ভাবনা আছে। হয়ত মিউজিয়মেই কোথাও লুকিয়ে ছিল চোর। সবাই চলে যাওয়ার পর কোন এক সুযোগে বেরিয়েছে।'

'উঁহু!' মাথা নাড়ল কিশোর। 'কাগজে লিখেছে, দর্শকরা সব বেরিয়ে যাওয়ার পর পুরো মিউজিয়ম খুঁজে দেখা হয়েছে। কারও পক্ষে তখন লুকিয়ে থাকা সম্ভব ছিল না।'

'হয়ত কোন গোপন ঘর আছে,' বলল রবিন। 'ওসব পুরানো বাড়িগুলোতে থাকে।'

চুপ করে কয়েক মুহূর্ত ভাবল কিশোর। তারপর মাথা নাড়ল ধীরে ধীরে, 'আমার মনে হয় না! তেমন ঘর থেকে থাকলে মিউজিয়ম কর্তৃপক্ষ জানবেই। আর গার্ডদের ব্যাপারটা...কি জানি...! একটা ব্যাপার মাথায় ঢুকছে না কিছুতেই, এটা বুঝলেই অনেকগুলো প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাব—হার না নিয়ে বেল্টটা নিল কেন ওরা? হারটার দাম বেশি, লুকানো সহজ, বেচতে পারত সহজে।'

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল গোয়েন্দাপ্রধান। চিমটি কেটে চলল নিচের ঠোঁটে।

'দেখি, আবার প্রথম থেকে একটা একটা পয়েন্ট আলোচনা করি,' বলল কিশোর। 'প্রথমেই লাইট চলে যাওয়ার ব্যাপারটা। এটা সহজ কাজ, বাইরে থেকে সহজেই করা গেছে। দুই, আলো চলে যাওয়ার পর গার্ডরা অসুবিধেয় পড়েছে। কারণ, বাচ্চা আর মহিলারা নরক গুলজার শুরু করে দিয়েছিল মিউজিয়মের ভেতর। গার্ডেরা দর্শক সামলাতেই হিমশিম খেয়ে গেছে, এই সুযোগে কাজ সেরে ফেলেছে চোর। তারমানে, ইচ্ছে করেই চিলড্রেনস ডে বেছে নিয়েছে চোরেরা। ঠিক কিনা?'

'ঠিক,' মাথা ঝাঁকাল মুসা।

'তিন, রেইনবো জুয়েলসের দিকেই লক্ষ্য বেশি ছিল গার্ডদের, ফলে বেল্টটা সহজেই হাতিয়ে নিতে পেরেছে চোর। বাক্সের চারপাশে দড়ির রিঙ, তার বাইরে থেকেই কাজটা করতে পারে একজন লম্বা মানুষ।'

'গার্ডদের অনেকেই খুব লম্বা,' মনে করিয়ে দিল রবিন।

'ঠিক,' সায় দিল কিশোর। 'বাক্স ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে অ্যালার্ম বেজে উঠল, দরজার দিকে দৌড় দিল কিছু গার্ড। দর্শকদেরকে বেরোতে দেয়া হল লনে, তাদেরকে তল্লাশি করা হল, তারপর ছেড়ে দেয়া হল।'

'এগুলো কোন তথ্য নয়,' বলল মুসা। 'এ-থেকে রহস্যের সমাধান করা যাবে না।...আচ্ছা, আমরা যেচে সাহায্য করতে চাইলাম, এমন ব্যবহার করল কেন জাপানী সিকিউরিটি অফিসার?'

ঠোঁট উল্টাল কিশোর। 'কি জানি! হয়ত আমাদেরকে বেশি ছেলেমানুষ মনে করেছে, তাই। ইস্‌স্, মিস্টার ক্রিস্টোফার ওই মিউজিয়মের ডিরেক্টর হলে কাজটা পেয়ে যেতাম আমরা!'

'তিনি নন,' বলল মুসা। 'ওকথা ভেবে আর কি লাভ?'

'মিস্টার মার্চের ব্যাপারটা বেশ সন্দেহজনক,' টেবিলে আস্তে আস্তে টোকা দিল কিশোর।

'মানে?' প্রায় একই সঙ্গে প্রশ্ন করল রবিন আর মুসা।

'মনে আছে কি কি করেছ। টেবিলে দুই কনুই রেখে সামনে ঝুঁকল কিশোর।

'মিস্টার মার্চ আমাকে বলেছে, এবার অভিনয় শুরু করবে সে। তারপর অভিনয় শুরু করেছে। পকেট থেকে রুমাল বের করে ঘাম মোছার ছলে ইচ্ছে করেই পাথর ফেলেছে। গার্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, সন্দেহ জাগিয়েছে। তারপর কি ঘটল?'

'কি ঘটল?' একই প্রশ্ন করল রবিন, এবং উত্তর দিল নিজেই, 'গার্ড চেঁচামেচি শুরু করল, অন্য গার্ডদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল, দর্শকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল মিস্টার মার্চের দিকে।'

'ঠিক তাই।' খুশি খুশি একটা ভাব ফুটেছে কিশোরের চেহারায়। 'দর্শক আর গার্ডদের নজর অন্যদিকে সরিয়ে দিল লোকটা। ওই সুযোগে অন্য অপরাধীরা তাদের যার যার কাজ করে গেছে নিরাপদে। এমন কিছু, যেটা আমাদের নজরে পড়েনি।'

'সেই এমন কিছুটা কি?' প্রশ্ন করল মুসা।

'সেটাই তো জানি না। তবে ওদের সময়জ্ঞানে আশ্চর্য হতেই হচ্ছে! পাথরটা মেঝেতে ফেলল মিস্টার মার্চ, এক গার্ড বাঁশি বাজাল, অন্য গার্ডরা দৌড়ে এল। তার এক কি দুই সেকেণ্ড পরেই দপ করে নিভে গেল সব বাতি। অন্ধকার হয়ে গেল ঘর, আর সেই সুযোগে গোল্ডেন বেল্ট চুরি করে পালাল চোরেরা। প্রতিটি কাজ নিখুঁতভাবে সেরেছে।'

চিন্তিত দেখাল রবিনকে। 'কিন্তু কারা ওরা? বেল্ট বের করে নিয়ে গেল কিভাবে?'

কিছু একটা বলার জন্যে মুখ খুলল কিশোর, ঠিক এই সময় তীক্ষ্ণ শব্দে বেজে উঠল টেলিফোন।

তৃতীয়বার রিঙ হতেই ফোনের তারের সঙ্গে যুক্ত লাউডস্পীকারের সুইচ টিপে অন করে দিল কিশোর। রিসিভার তুলে নিল। 'হ্যালো।'

'কিশোর পাশা?' মহিলা কণ্ঠ বেজে উঠল স্পীকারে। 'মিস্টার ডেভিস কিস্টোফার চাইছেন তোমাকে।'

বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়ে গেল যেন তিন গোয়েন্দার চোখে মুখে। দীর্ঘদিন পর আবার এসেছে ডাক! মিস্টার ক্রিস্টোফার চাইছেন, তারমানে নিশ্চয় জটিল কোন রহস্য।

'কিশোর বলছি।'

'ধরে থাক, প্লীজ।'

দুই সেকেণ্ড খুটখাট শব্দ হল স্পীকারে। তারপরই ভেসে এল ভারি গমগমে কণ্ঠস্বর। 'হ্যালো, কিশোর। কেমন আছ তোমরা?'

'ভাল, স্যার!' উত্তেজনায় কাঁপছে কিশোরের গলা।

'হাতে কোন কাজ আছে এখন তোমাদের। মানে কোন কেস?'

'না, স্যার, কিচ্ছু নেই! বসে থেকে থেকে...'

'তাহলে একটা কাজ দিচ্ছি। আমার এক লেখিকা বান্ধবীকে সাহায্য করতে পারবে?'

'সাহায্য? কি সাহায্য!'

এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। বোধহয় গুছিয়ে নিচ্ছেন মনে মনে। 'কি বলল ঠিক বুঝতে পারছি না। ওর সঙ্গে দেখা হয়নি আমার, ফোনে কথা হয়েছে। রত্নদানোরা নাকি বিরক্ত করছে ওকে।'

'র-ত্ন-দা-নো!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।

স্তব্ধ হয়ে গেছে যেন রবিন আর মুসা।

'তাই তো বলল,' বললেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। 'রত্নদানো। ওই যে, খুদে পাতাল-মানব, যারা নাকি চামড়ার পোশাক পরে, পাতালে বাস করে, আর সুড়ঙ্গ কেটে কেটে খালি রত্নের সন্ধানে ফেরে।'

'রত্নদানো কি, জানি, স্যার। কিন্তু ওরা তো কল্পিত জীব, কেচ্ছা কাহিনীতে আছে। সত্যি,সত্যি আছে বলে তো শুনিনি কখনও!'

'আমিও শুনিনি।। কিন্তু আমার বান্ধবী বলছে, সে নিজের চোখে দেখেছে। রাতে চুরি করে তার ঘরে ঢুকে পড়ে দানোরা, সমস্ত ছবি উল্টেপাল্টে রাখে, বই ছড়িয়ে ফেলে দিয়ে যায় যেখানে সেখানে। পুলিশকে বলেছে সে, কিন্তু পুলিশ এমনভাবে তাকিয়েছে যেন মহিলার মাথা খারাপ। ভীষণ অসুবিধেয় পড়ে শেষে আমাকে জানিয়েছে সে।'

কয়েক মহূর্ত নীরবতা।

'কিশোর, ওকে সাহায্য করতে পারবে?'

'পারব কিনা জানি না, তবে চেষ্টা তো নিশ্চয় করব! ঠিকানাটা দেবেন?'

কাগজ-কলম টেনে নিয়ে ঠিকানা লিখে নিল রবিন।

ছেলেদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে লাইন কেটে দিলেন চিত্র পরিচালক।

'যাক!' জোরে একটা শ্বাস ফেলল কিশোর। 'গোল্ডেন বেল্টের কেস পাইনি, কিন্তু তার চেয়েও মজার একটা পেলাম! রত্নদানো! চমৎকার!'

চার

মিস শ্যানেল ভারনিয়া থাকেন লস অ্যাঞ্জেলেস-এর শহরতলীতে। বাসে যেতে অসুবিধে, একটা গাড়ি হলে ভাল হয়। মেরিচাচীকে ধরল তিন গোয়েন্দা। ইয়ার্ডের ছোট ট্রাকটা দিতে রাজি হলেন চাচী। চালিয়ে নিয়ে যাবে দুই ব্যাভারিয়ান ভাইয়ের একজন, বোরিস।

খালি মুখে বেরোতে রাজি হল না মুসা। অগত্যা কিশোর আর রবিনকেও টেবিলে বসতে হল।

খেয়ে দেয়ে মস্ত ঢেকুর তুলল মুসা। পেটে হাত বুলিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, এইবার দানো শিকারে যাওয়া যায়।'

'আর কিছু খাবে?' মুসাকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'আর?' টেবিলের শূন্য প্লেটগুলোর দিকে চেয়ে বলল মুসা। 'আর তো কিছু নেই!'

মুচকি হেসে উঠে গিয়ে ফ্রিজ খুলে একটা জগ বের করল কিশোর। নিয়ে এসে বসল আবার টেবিলে।

'কমলার রস।' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'দাও দাও, জলদি দাও! ইস্‌স্‌, পুডিংটা খাওয়া উচিত হয়নি! তবে তেমন ভাবনা নেই। পানির ভাগ বেশি তো, পেটে বেশিক্ষণ থাকবে না।'

দুটো গেলাসে কমলালেবুর রস ঢেলে একটা রবিনকে দিল কিশোর। আরেকটা নিজে রেখে জগটা ঠেলে দিল মুসার দিকে।

প্রায় ছোঁ মেরে জগটা তুলে নিয়ে ঢকঢক করে খেতে শুরু করল মুসা। হঠাৎ কি মনে পড়ে যাওয়ায় মুখের সামনে থেকে জগ সরিয়ে বলল, 'কিশোর, গোল্ডেন বেল্ট কি করে চুরি হয়েছে, বুঝে গেছি!'

অবাক হয়ে মুসার দিকে তাকাল কিশোর আর রবিন। 'কি করে?'

'গার্ল স্কাউটের লীডার মেয়েটাকে দেখেছিলে না? ওর মাথায় বড় বড় চুল ছিল। আমার মনে হয় পরচুলা। পরচুলার নিচে করে নিয়ে গেছে বেল্টটা!'

মুসার বুদ্ধি দেখে গোঙানি বেরোল কিশোরের।

রবিন বলল, 'খেয়ে খেয়ে মাথায় আর কিছু নেই ওর! পরচুলার নিচে কবে গোল্ডেন বেল্ট? তা-ও যদি বলত চোরাখুপরিওলা কোন লাঠির কথা···কিশোর, পেয়েছি! লাঠি! হ্যাঁ, এক বুড়োকে মোটা লাঠি হাতে দেখেছি সেদিন! নিশ্চয় ওটার চোরা খুপরির ভেতরে ভরে···'

'তোমাদের দু'জনের মাথায়ই গোবর,' থামিয়ে দিয়ে বলল কিশোর। 'পনেরো পাউণ্ড ওজনের তিন ফুট লম্বা একটা বেল্ট! হারটা হলে পরচুলা কিংবা লাঠির ভেতরে করে নিয়ে যেতে পারত। কিন্তু এতবড় বেল্ট···অসম্ভব! অন্য কিছু ভাব।'

'আর কিছু ভাবতে পারব না আমি,' আবার মুখে জগ তুলল মুসা।

'আমার মাথায়ও আর কিছু আসছে না!' এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল রবিন। 'চুলোয় যাক গোল্ডেন বেল্ট! হ্যাঁ, এনসাইক্লোপীডিয়ায় দেখলাম, রত্নদানো···'

'···এখন না, গাড়িতে উঠে বল,' চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'দেখি, বোরিস গাড়ি বের করল কিনা।'

সামনের সিটে বোরিসের পাশে গাদাগাদি করে বসল তিন গোয়েন্দা। মিস ভারনিয়ার বাড়ির ঠিকানা দিল বোরিসকে কিশোর। ইয়ার্ড থেকে বেরিয়ে পথে উঠে এল হাফটাক, ছুটে চলল লস অ্যাঞ্জেলেস-এর শহরতলীর দিকে।

'হ্যাঁ, এইবার বল রবিন, রত্নদানোর ব্যাপারে কি কি জেনেছ?' বলল কিশোর।

'রত্নদানো হল,' লেকচারের ভঙ্গিতে শুরু করল রবিন, 'এক ধরনের ছোট্ট জীব, মানুষের মতই দেখতে, কিন্তু স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে অনেক ছোট, বামনদের সমান কিংবা তার চেয়েও ছোট। ওরা থাকে মাটির তলায়, গুপ্তধন খুঁজে বের করাই ওদের কাজ। রত্নদানোদের সঙ্গে বাস করে কুৎসিত চেহারার আরেক জাতের জীব, গবলিন। গবলিনরা দক্ষ কামার। শাবল, কোদাল, গাঁইতি বানাতে ওদের জুরি নেই। স্বর্ণকার হিসেবেও ওরা ওস্তাদ। সোনা আর নানারকম মূল্যবান পাথর দিয়ে চমৎকার গহনা বানায় রত্নদানোদের রানী আর রাজকুমারীদের জন্যে।'

'এসব তো কিসসা!' ঘঁউক করে এক ঢেকুর তুলল মুসা। 'আরিব্বাপরে, খাওয়াটা বেশিই হয়ে গেছে! থাকগে, রাতে দেরি করে খেলেই হবে!...হ্যাঁ, যা বলছিলাম, রত্নদানো, গবলিন, এসব হল গিয়ে কল্পনা। মি...মিউথো...'

'মিথোলজি,' বলে দিল কিশোর।

'হ্যাঁ, মিথোলজির ব্যাপার-স্যাপার। বাস্তবে নেই। মিস ভারনিয়ার বাড়িতে আসবে কোত্থেকে?' নড়েচড়ে বসল মুসা।

'সেটাই তো জানতে যাচ্ছি আমরা।'

'কিন্তু রত্নদানো তো বাস্তবে নেই,' আবার বলল মুসা।

'কে বলল নেই?' পথের দিকে নজর রেখে বলে উঠল বোরিস। 'ব্যাভারিয়ার ব্ল্যাক ফরেস্টে জায়গাটা খুব খারাপ!'

'দেখলে তো?' হাসি চাপল কিশোর। 'রত্নদানো আছে, এটা বোরিস বিশ্বাস করে।'

'বোরিস করে, সেটা আলাদা কথা,' পেটটা সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে বিড়বিড় করল মুসা। 'বোতাম খুলে দেব নাকি প্যান্টের? যাকগে, হজম হয়ে যাবে একটু পরেই।...হ্যাঁ, এটা ব্ল্যাক ফরেস্ট নয়। আমেরিকার—ক্যালিফোর্নিয়ার-লস, অ্যাঞ্জেলেস। এখানে রত্নদানো আসবে কোত্থেকে, কি করে?'

'হয়ত রত্ন খুঁজতেই এসেছে,' মুসার হাঁসফাঁস অবস্থা দেখে হাসছে রবিন। 'ক্যালিফোর্নিয়ায় কি রত্ন নেই, সোনার গহনা নেই? ১৮৪৯ সালে সোনার খনিও পাওয়া গেছে ক্যালিফোর্নিয়ায়। খবরটা হয়ত অনেক দেরিতে পেয়েছে ওরা, তাই এতদিন পরে এসেছে। মাটির তলায় খবর যেতে দেরি হলে অবাক হওয়ার কিছু নেই।'

'রত্নদানো থাকুক বা না থাকুক,' হালকা কথাবার্তা থামিয়ে দিয়ে বলল কিশোর। 'রহস্যজনক কিছু একটা ঘটছে মিস ভারনিয়ার বাড়িতে, এটা ঠিক। ওখানে গেলেই হয়ত জানতে পারব।'

শহরতলীর অতি পুরানো একটা অঞ্চলে এসে ঢুকল ওরা। গাড়ির গতি কমিয়ে

রাস্তার নাম্বার খুঁজতে লাগল বোরিস। বিরাট একটা পুরানো বাড়ির কাছে এনে গাড়ি থামাল।

বাড়ি না বলে দুর্গ বলা চলে ওটাকে। অসংখ্য গম্বুজ, মিনার, স্তম্ভ রয়েছে। যেখানে সেখানে নকশা আর ফুল আঁকা হয়েছে সোনালি রঙ দিয়ে, বেশির ভাগ জায়গায়ই বিবর্ণ হয়ে গেছে কিংবা চটে গেছে রঙ। অস্পষ্ট একটা সাইনবোর্ড পড়ে বোঝা গেল ওটা একটা থিয়েটার বাড়ি, মূরেরা তৈরি করেছিল। পুরানো সাইনবোর্ডটার কাছেই আরেকটা নতুন সাইনবোর্ড—বারোতলা অফিস তৈরি হচ্ছে।

খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক চেয়ে আবার গাড়ি ছাড়ল বোরিস। থিয়েটারের পর একটা উঁচু পাতাবাহারের বেড়া পেরিয়ে এল। পলকের জন্যে বেড়ার ওপাশে, অন্ধকার, সরু লম্বা একটা দালান চোখে পড়ল কিশোরের। বেড়ার পরে আরেকটা বাড়ি, একটা ব্যাংক, পুরানো ধাঁচের বাড়ি, পাথরে তৈরি দেয়াল।

আরেকটা ব্লকের কাছে চলে এল ট্রাক। এখানে একটা সুপারমার্কেট, দোকানগুলো পুরানো। অনেক আগে এটা বাণিজ্যিক এলাকা ছিল, বোঝাই যাচ্ছে।

'বাড়িটা পেছনে ফেলে এসেছি,' ব্যাংক আর সুপারমার্কেটের মাঝখানে বসানো পাথর ফলকে রাস্তার নাম্বার দেখে বলল কিশোর।

'বেড়ার ওপাশের বাড়িটাই হবে,' রবিন বলল। 'একমাত্র ওটাকেই বসতবাড়ির মত দেখতে লাগছে।'

'পিছিয়ে নিয়ে গিয়ে কোথাও পার্ক করুন,' বোরিসকে বলল কিশোর।

খানিকটা পিছিয়ে এনে পাতাবাহারের বেড়ার ধারে গাড়ি পার্ক কলল বোরিস। ছয়ফুট উঁচু গাছগুলো অযত্নে বেড়ে উঠেছে, মাথা সবগুলোর সমান নয়, রাস্তার ধুলোবালিতে আসল রঙ হারিয়ে গেছে রঙিন পাতার। বেড়ার ওপাশে পুরানো বাড়িটার দিকে আবার তাকাল কিশোর, মনে হল, বাইরের ব্যস্ত দুনিয়া থেকে অনেক দূরে সরে আছে ওটা।

বেড়ার ধার ধরে হেঁটে গেল মুসা। খানিকটা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল সাদা রঙ করা ছোট একটা গেটের সামনে। চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে, এই তো! মিস শ্যানেল ভারনিয়া!'

মুসার পাশে এসে দাঁড়াল কিশোর আর রবিন।

'এটা একটা জায়গা হল!' বলল মুসা। 'দুনিয়ায় এত জায়গা থাকতে এই ভূতের গলিতে এসে বাসা বাঁধলেন কেন মহিলা!...আরিসব্বোনাশ! কাণ্ড দেখেছ!' আঙুল তুলে গেটের এক জায়গায় সাঁটানো কাগজ দেখাল সে। যাতে নষ্ট না হয়, সেজন্যে কাচ দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে, কিন্তু তবু রোদে হলদেটে হয়ে গেছে সাদা মোটা কাগজ। বিড়বিড় করে পড়ল মুসা, 'মানুষ হলে বেল বাজান, প্লীজ। রক্তদানো, বামন কিংবা খাটোভূত হলে শিস দাও। সেরেছে, কিশোর, পাগল!

পাগলের পাল্লায় পড়তে যাচ্ছি! চল, ভাগি!'

ভুরু কুঁচকে লেখাটার দিকে চেয়ে আছে কিশোর। 'বোঝা যাচ্ছে, ওই সব কল্পিত জীবগুলোর অস্তিত্ব বিশ্বাস করেন মিস ভারনিয়া। মুসা, এক কাজ কর, শিস দাও...'

ফিক করে হেসে ফেলল রবিন।

'কী!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'আমি কি রক্তদানো নাকি?'

'রক্তদানো না হলেও পেটুকদানো, এতে কোন সন্দেহ নেই। যা বলছি, কর। শিস দাও। দেখা যাক, কি ঘটে।'

কিশোর ঠাট্টা করছে না বুঝতে পেরে আর প্রতিবাদ করল না মুসা। ঠোঁট গোল করে টানা তীক্ষ্ণ শিস দিয়ে উঠল।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। পাতাবাহারের ঝোপের ভেতরে কথা বলে উঠল কেউ, 'কে?'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাপারটা বুঝতে পারল কিশোর। ঝোপের ভেতরে স্পীকার লুকিয়ে রাখা হয়েছে। বাড়ির ভেতরে বসে স্পীকারের মাধ্যমে কথা বলছে কেউ। বড় বড় এলাকা নিয়ে লস অ্যাঞ্জেলেসে যে সব বাড়ি তৈরি হচ্ছে আজকাল, অনেক বাড়িতেই এই স্পীকারের ব্যবস্থা রয়েছে। এগিয়ে গিয়ে উঁকি দিল ঝোপের ভেতরে। কিছু দেখা গেল না। দু'হাতে পাতা আর ডাল সরাতেই দেখা গেল জিনিসটা। পাখি পোষার ছোট বাক্সে বসানো হয়েছে স্পীকার, বৃষ্টি থেকে রক্ষা করার জন্যে। মাইক্রোফোন বসানো রয়েছে স্পীকারের পাশেই।

'গুড আফটারনুন, মিস ভারনিয়া,' মার্জিত গলায় বলল কিশোর। 'আমরা তিন গোয়েন্দা। মিস্টার ক্রিস্টোফার পাঠিয়েছেন। আপনার সমস্যা নিয়ে কথা বলতে এসেছি আমরা।'

'ও, নিশ্চয় নিশ্চয়! তালা খুলে দিচ্ছি,' মিষ্টি হালকা গলা।

গেটে মৃদু গঞ্জন উঠল। বাড়ির ভেতরে বসেই নিশ্চয় সুইচ টেপা হয়েছে, মেকানিজম কাজ করতে শুরু করেছে পাল্লার, খুলে গেল ধীরে ধীরে।

আগে ভেতরে ঢুকল কিশোর। তার পেছনে মুসা আর রবিন।

পেছনে গেটটা আবার বন্ধ হয়ে যেতেই থমকে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা। ওদের মনে হল, বাইরের জগত থেকে আলাদা হয়ে গেল যেন। মাথা ছাড়িয়ে উঠে গেছে ছয় ফুট উঁচু বেড়া, রাস্তা দেখা যায় না। এক পাশে পরিত্যক্ত থিয়েটার বাড়ির পুরানো দেয়াল উঠে গেছে কয়েক তলা সমান উঁচুতে। আরেক পাশে ব্যাংকের গ্র্যানিট পাথরের দেয়াল। দেয়াল বেড়া সবকিছু মিলে সরু পুরানো বাড়িটাকে গিলে ফেলার চেষ্টা চালাচ্ছে যেন। বাড়িটা তিন তলা, কিছু কিছু ঘরের দেয়াল রেডউড কাঠে তৈরি, কড়া রোদ বিবর্ণ করে দিয়েছে কাঠের রঙ। নিচের তলায় সামনের দিকে বারান্দা, কয়েকটা টবে লাগানো ফুল গাছে ফুল ফুটেছে, পুরো

এলাকাটায় তাজা উজ্জ্বল রঙ বলতে শুধু ওই ফুল ক'টাই।

একই সময়ে প্রায় একই অনুভূতি হচ্ছে তিনজনের। বাড়িটা দেখতে দেখতে ওদের মনে হল, রূপকথার পাতা থেকে উঠে এসেছে যেন কোন ডাইনীর বাড়ি।

কিন্তু মিস শ্যানেল ভারনিয়াকে মোটেই ডাইনীর মত লাগল না। সদর দরজা খুলে দাঁড়িয়েছেন। লম্বা, পাতলা শরীর, চঞ্চল চোখ, সাদা চুল।

'এস,' পাখির গলার মত মোলায়েম মিষ্টি কণ্ঠস্বর মিস ভারনিয়ার। 'তোমরা আসাতে খুব খুশি হয়েছি। এস, ভেতরে এস।'

লম্বা হলঘর পেরিয়ে বড়সড় লাইব্রেরিতে ছেলেদেরকে নিয়ে এলেন লেখিকা। দেয়াল ঘেঁষে বড় বড় আলমারি, বুক-শেলফ, বই উপচে পড়ছে। দেয়ালের জায়গায় জায়গায় ঝোলানো রয়েছে সুন্দর পেইন্টিং আর ফটোগ্রাফ, সবই বাচ্চা ছেলেমেয়ের।

'বস,' তিনটে চেয়ার দেখিয়ে বললেন লেখিকা। 'হ্যাঁ, যে জন্যে ডেকেছি তোমাদেরকে,' কোন রকম ভূমিকা না করে শুরু করলেন তিনি। 'রত্নদানোরা বড় বিরক্ত করছে আমাকে। কয়েকদিন আগে পুলিশকে জানিয়েছিলাম, আমার দিকে যে-রকম করে তাকাল, রত্নদানোর কথা বলতে আর কোনদিন যাব না ওদে কাছে...'

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল রবিন। আর্মচেয়ারে আরাম করে বসেছিল, এখন সোজা হয়ে গেছে পিঠ, জানালার দিকে চেয়ে আছে। চোখে অবিশ্বাস। জানালার বাইরে একটা ছোট্ট মানুষের মত জীব! মাথায় টোপরের মত টুপি। বিচ্ছিরি দাড়িতে মাটি লেগে আছে, কাঁধে একটা ঝকঝকে গাঁইতি। মুখ ভয়ানক বিকৃত, চোখ লাল।

পাঁচ

'রত্নদানো! চেঁচিয়ে বলল রবিন। 'আমাদের ওপর নজর রাখছিল!'

'কই, কোথায়!' প্রায় একই সঙ্গে বলে উঠল মুসা আর কিশোর।

'ওই যে, ওখানে, জানালার বাইরে ছিল!' আঙুল তুলে জানালাটা দেখা রবিন। 'চলে গেছে! হয়ত আঙিনায়ই আছে এখনও!'

তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ছুটল রবিন। তার পেছনে কিশোর, সবার পেছনে মুসা। দুটো আলমারির মাঝের ফাঁকে একটু অন্ধকার মত জায়গায় রয়েছে 'জানালাটা'। চোখ মিটিমিটি করে তাকাল রবিন, হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখল মসৃ কাচ।

'আয়না,' বলল কিশোর। 'প্রতিবিম্ব দেখেছ, রবিন।'

ফিরে তাকাল অবাক রবিন। মিস ভারনিয়াও উঠে দাঁড়িয়েছেন। আয়না উল্টো দিকের একটা জানালা দেখালেন তিনি। আয়নার দিকে আঙুল ম

বললেন, 'ওদিকটা অন্ধকার হয়ে থাকে, তাই আয়না বসিয়েছি। জানালার আলো প্রতিফলিত করে।'

ছুটে খোলা জানালার কাছে চলে এল ছেলেরা। মাথা বাড়িয়ে বাইরে উঁকি দিল কিশোর, আঙিনাটা দেখল। 'কেউ নেই!'

কিশোরের পাশে দাঁড়িয়ে মুসাও জানালার বাইরে মাথা বের করে দিল। 'নাহ্, কেউ নেই আঙিনায়! রবিন, তুমি ঠিক দেখেছিলে তো?'

জানালার নিচে তাকাল রবিন, শূন্য থিয়েটার বাড়ির উঁচু দেয়াল দেখল। কোথাও কিচ্ছু নেই। দাড়িওয়ালা রত্নদানোর ছায়াও চোখে পড়ছে না।

'আমি ওকে দেখেছি!' দৃঢ়কণ্ঠে বলল রবিন। 'নিশ্চয় বাড়ির আশপাশে কোথাও লুকিয়ে পড়েছে। গেট বন্ধ, বাইরে যেতে পারবে না। খুঁজলে এখনও হয়ত পাওয়া যেতে পারে ওকে।'

'পাবে না, কারণ ওটা রত্নদানো,' বলে উঠলেন মিস ভারনিয়া। 'জাদুবিদ্যায় ওস্তাদ ওরা।'

'কিন্তু তবু খুঁজে দেখতে চাই.' বলল কিশোর: 'পেছনে কোন গেট-টেট আছে?'

মাথা ঝাঁকাল লেখিকা। তিন গোয়েন্দাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এলেন বাড়ির পেছনের আরেকটা ছোট বারান্দায়। ওখান থেকে আঙিনায় নেমে পড়ল ছেলেরা।

'মুসা, তুমি বাঁয়ে যাও,' নির্দেশ দিল কিশোর। 'রবিন, তুমি এস আমার সঙ্গে। ডানে যাব।'

তেমন বিশেষ কোন জায়গা নেই, যেখানে লুকিয়ে থাকতে পারে রত্নদানো। আঙিনায় ছোট ছোট কয়েকটা ঝোপ। বাড়ির পেছনে কাঠের বেড়া, বেড়ার ওপাশে সরু গলি। বেড়ায় কোন ফোকর নেই, যেখান দিয়ে গলে বেরোতে পারে রত্নদানো। পেছনে একটা গেট আছে, তালাবদ্ধ। পুরানো, মরচে ধরা লোহার গেট, দেখেই বোঝা যায়, অনেক বছর ধরে খোলা হয়নি। ওই গেট পেরোলেই থিয়েটার বাড়ির সীমানা।

'ওদিক দিয়ে যায়নি,' মাথা নাড়ল রবিন।

যত ছোটই হোক, তবু সব ক'টা ঝোপ খুঁজল রবিন আর কিশোর, নিচতলায় ভাঁড়ারের জানালাগুলো পরীক্ষা করল বাইরে থেকে। জানালার পাল্লাগুলো অসম্ভব নোংরা, দীর্ঘদিন খোলাও হয়নি, পরিষ্কারও করা হয়নি। বাড়ির সামনের দিকে বেড়ার ধারে চলে এল দু'জনে। পুরো বেড়াটা পরীক্ষা করল, কোথাও ফোকর নেই, ঠাসাঠাসি করে দাঁড়িয়ে আছে পাতাবাহারের গাছ। বামন-আকৃতির একটা মানুষেরও আঙিনা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কোন পথ নেই, একমাত্র গেট ছাড়া।

তাহলে? যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে রত্নদানো!

মুসাও ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছে।

'চল তো,' কিশোর বলল। 'জানালার নিচে পায়ের দাগ আছে কিনা দেখি।'

লাইব্রেরি ঘরের যে জানালায় রত্নদানো দেখেছে রবিন, সেটার নিচে চলে এল তিনজনে। শুকনো কঠিন মাটি, পায়ের ছাপ নেই, পড়েনি।

'নেই!' দেখতে দেখতে বলল কিশোর। 'আরেকটা রহস্য!'

'মানে!' ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করল রবিন।

উবু হয়ে মাটি থেকে কিছু তুলে নিল কিশোর। 'এই যে, দেখ, আলগা মাটি। জুতোর তলা থেকে খসে পড়েছে।'

'মিস ভারনিয়ার টবের মাটিও হতে পারে,' বলল রবিন। 'কোনভাবে পড়েছে এখানে।'

'সম্ভাবনা কম,' ওপর দিকে চেয়ে আছে কিশোর। 'জানালাটা দেখ। চৌকাঠের নিচটাও আমাদের মাথার ওপরে। রবিন, খুব ছোট একটা মানুষকে দেখেছিলে, না?'

'মানুষ না, রত্নদানো!' জবাব দিল রবিন, 'ফুট তিনেক লম্বা! মাথায় টোপরের মত টুপি, নোংরা দাড়ি, কাঁধে ধরে রেখেছে গাঁইতি। ওর কোমর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল। এমনভাবে চেয়ে ছিল আমার দিকে, যেন ভীষণ রেগে গেছে।'

'তা কি করে হয়?' নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল কিশোর। 'জানালার চৌকাঠ মাটি থেকে ছয় ফুট উঁচুতে। তিন ফুট লম্বা রত্নদানোর কোমর দেখা যাবে কিভাবে? ওর মাথাই তো দেখা যাওয়ার কথা না!'

প্রশ্নটা প্রচণ্ড ভাবে নাড়া দিল রবিন আর মুসাকে।

'হয়ত মই,' খানিকক্ষণ চুপ করে ভেবে বলল মুসা। 'হয়ত কেন, নিশ্চয়ই মই!'

'নিশ্চয়!' ব্যঙ্গ প্রকাশ পেল কিশোরের গলায়। 'ভাঁজ করে এই এতোটুকুন করে সেই মই পকেটে ভরে ফেলা যায়! তোমার কি ধারণা? মই পকেটে নিয়ে ফোর্থ ডাইমেনশনের কোন গর্তে ঢুকে পড়েছে দানোটা?'

কিশোরের কথার ধরনই ওমনি, রাগ করল না মুসা। মাথা চুলকাতে লাগল।

ভ্রূকুটি করল রবিন। 'ওরা জাদু জানে। জাদুর বলে বাংলাদেশে ভানুমতির খেল দেখিয়ে ভ্যানিস হয়ে গেছে।'

'আমার মনে হয় আসলে কিছু দেখনি তুমি, রবিন,' বলল কিশোর। 'হয়ত কল্পনা করেছ, মানে, কল্পনার চোখে দেখেছ।'

'আমি ওটা দেখেছি!' জোর দিয়ে বলল রবিন। 'ওর চোখও দেখেছি! টকটকে লাল, জ্বলন্ত কয়লার মত জ্বলছিল!'

'লাল চোখওয়ালা রত্নদানো! ইয়াল্লা!' শুঙিয়ে উঠল মুসা। রবিন, দোহাই তোমার, বল, ওটা তোমার কল্পনা!'

বার বার ছাগলকে কুকুর বলছে ওরা!—নিজের দৃষ্টিশক্তির ওপর সন্দিহান হয়ে

উঠল রবিন। তাই তো, বেশিক্ষণ তো দেখিনি ওটাকে। মাত্র এক পলক! 'কি জানি!' গলায় আর আগের জোর নেই তার। 'মনে তো হল, দেখেছি! কিন্তু···কি জানি, কল্পনাও হতে পারে! তখন অবশ্য এনসাইক্লোপীডিয়ায় দেখা রত্নদানোর ছবির কথা ভাবছিলাম। নাহ্, খুব সম্ভব কল্পনাই করেছি!'

'কল্পিত জীবকে পাওয়া যাওয়ার কথা না,' দ্বিধায় পড়ে গেছে কিশোর। 'কিন্তু যদি সত্যি দেখে থাক, তাহলে জাদু জানে ব্যাটা! গায়েব হওয়ার মন্ত্র!'

'এছাড়া বেরোবে কি করে আঙিনা থেকে?' যোগ করল মুসা।

'চল, ঘরে যাই,' বলল কিশোর। 'মিস ভারনিয়ার কথা শুনিগে। এখানে দাঁড়িয়ে থেকে আর লাভ নেই।'

সামনের বারান্দা দিয়ে আবার ঘরে ঢুকল ওরা। হল পেরিয়ে লাইব্রেরিতে এল।

'ওকে পাওনি তো?' জিজ্ঞেস করলেন লেখিকা।

'নাহ্,' মাথা নাড়ল রবিন। 'গায়েব!'

'আমি জানতাম, পাবে না,' মাথা দুলিয়ে বললেন মিস ভারনিয়া। 'রত্নদানোরা ওরকমই, এই আছে এই নেই! তবে আমিও অবাক হয়েছি, দিনের বেলায় আসতে দেখে। দিনের আলোয় সাধারণত বেরোয় না ওরা। জাকগে, এস আগে চা খেয়ে নিই। তারপর বলল, কি কি ঘটেছে।'

চীনামাটির কেটলি থেকে কাপে চা ঢালতে ঢালতে বললেন লেখিকা, 'আশা করি তোমরা আমাকে সাহায্য করতে পারবে। কিস্টোফারের খুব ভাল ধারণা তোমাদের ওপর। কয়েকটা অদ্ভুত রহস্য নাকি ভেদ করেছ।'

'তা করেছি,' সবার আগে কাপ টেনে নিয়ে চায়ে প্রচুর পরিমাণে দুধ আর চিনি মেশাতে লাগল মুসা। 'তবে বেশির ভাগ কৃতিত্বই কিশোরের, তাই না রবিন?'

'অন্তত আশি পার্সেন্ট,' গম্ভীর গলায় বলল নথি। 'বাকি বিশ পার্সেন্ট আমাদের দু'জনের। কিশোর, ঠিক না? এই কিশোর?'

পাশের একটা কাউচে পড়ে থাকা খবরের কাগজের হেডলাইনে মনোযোগ কিশোরের। রবিনের ডাকে মুখ না ফিরিয়েই বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, মিস ভারনিয়া, রবিন আর মুসার সাহায্য ছাড়া একটা রহস্যও ভেদ করতে পারতাম না।'

'মিউজিয়মের খবরটা দেখছ মনে হচ্ছে?' চা আর বিস্কুট বাড়িয়ে ধরে কিশোরকে বললেন মিস ভারনিয়া। 'কি যে হয়েছে দিনকাল! চারদিকে খালি গোলমাল আর গোলমাল! রহস্যের ছড়াছড়ি!'

একটা বিস্কুট আর কাপটা নিল কিশোর। এক কামড় বিস্কুট ভেঙে চিবিয়ে চা দিয়ে গিলে নিল। 'গোল্ডেন বেল্টটা যখন চুরি হয়, তখন মিউজিয়মেই ছিলাম আমরা, সে এক তাজ্জব কাণ্ড! সাহায্য করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু রাজি হলেন না

সিকিউরিটি ইনচার্জ। আমরা নাকি বড় বেশি ছেলেমানুষ।'

'ভাগিয়ে দিলেন, সেকথা বলছ না কেন?' এক সঙ্গে দুটো বিস্কুট মুখে পুরেছে মুসা, কথা অস্পষ্ট।

'আরে, এ কি!' মুসার দিকে চেয়ে বলে উঠল কিশোর। 'এই না একটু আগে হাঁসফাঁস করছিলে বেশি খেয়ে ফেলেছিলে বলে?'

'ও হ্যাঁ, তাই তো!' কিশোর মনে করিয়ে দেয়ায় যেন মনে পড়ল মুসার। পেটে হাত রাখল। প্লেট থেকে বড় আকারের আরও গোটা চারেক বিস্কুট এক সঙ্গে তুলে নিয়ে বলল, 'এই ক'টাই, ব্যস, আর খাব না। আরে, এত উত্তেজনা, পেটের কথা মনে থাকে নাকি?'

মুচকি হাসল কিশোর।

'আরে থাক, থাক,' বললেন মিস ভারনিয়া। 'ছেলেমানুষ, এই তো তোমাদের খাওয়ার বয়েস।...হ্যাঁ, যা বলছিলাম। ইনচার্জ তোমাদেরকে ভাগিয়ে দিয়ে উচিত করেনি। তবে আমার জন্যে ভালই হল। তোমরা অন্যখানে ব্যস্ত থাকলে আমার এখানে আসতে পারতে না। খাও, চা-টা আগে শেষ কর, তারপর কথা হবে।'

মিস ভারনিয়ার ভরসা পেয়ে পুরো প্লেট খালি করে দিল মুসা। আরেক কাপ চা নিয়ে আবার দুধ আর চিনি মেশাতে শুরু করল।

'পুরানো দিনের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে!' বললেন লেখিকা। 'আহা, কি সব দিনই না ছিল। কতদিন পর আবার ছেলেদের সঙ্গে বসে চা খাচ্ছি! পুরো একটা হপ্তাও পেরোত না, টি-পার্টি দিতাম, রত্নদানো, বামন আর খাটোভূতদের নিয়ে।'

বিষম খেল মুসা। গলায় চা আটকে যাওয়ায় কাশতে শুরু করল। বিস্কুটে কামড় বসিয়ে মাঝ পথেই থেমে গেল রবিন।

শুধু কিশোরের অবস্থা স্বাভাবিক রইল। শান্ত কণ্ঠে বলল, 'প্রতিবেশী, বাচ্চাদের দাওয়াত করতেন, না? ওদের নামই দিয়েছেন রত্নদানো, বামন আর খাটোভূত?'

'নিশ্চয়।' হাসি ফুটল লেখিকার মুখে। 'খুব চালাক ছেলে তো তুমি! কি করে বুঝলে?'

'ডিডাকশন,' খালি কাপটা টিপয়ে নামিয়ে রাখল কিশোর। দেয়ালে ঝোলানো ছবিগুলো দেখিয়ে বলল, 'সব বাচ্চাদের ছবি। পোশাক-আশাক পুরানো ছাঁটের, এখন আর ওসব ডিজাইন কেউ পরে না। কোন কোন ছবির নিচে লেখা দেখলামঃ প্রিয় মিস ভারনিয়াকে। আপনি একজন লেখিকা, কল্পিত জীব নিয়ে অনেক বই লিখেছেন, সবই বাচ্চাদের জন্যে। দুটো বই পড়েছিও আমি। দারুণ বই। রত্নদানো আর খাটোভূতের চরিত্রগুলো সব মানুষের বাচ্চার মত। ধরেই নিলাম, আদর করে আপনার বাচ্চা বন্ধুদেরকে ওসব নামে ডাকেন।'

হাঁ হয়ে গেছে রবিন আর মুসা। ওই দুটো বই ওরাও পড়েছে, দেয়ালে

টাঙানো ছবিগুলোও দেখেছে। কিন্তু কিশোরের মত ভেবেও দেখেনি, গুরুত্বও দেয়নি।

'ঠিক, ঠিক বলেছ।' আনন্দে বাচ্চা মেয়ের মত হাততালি দিয়ে উঠলেন মিস ভারনিয়া। 'তবে একটা ব্যাপার ভুল বলেছ। বামন কিংবা খাটোভূত কল্পিত হতে পারে, কিন্তু রত্নদানোরা নয়। ওরা বাস্তব। আমি শিওর।' একটু থেমে বললেন, 'আমার বাবার যথেষ্ট টাকা পয়সা ছিল। আমি যখন বাচ্চা ছিলাম, আমার জন্যে একজন গভর্নেস রেখে দিয়েছিলেন বাবা। কি সব সুন্দর সুন্দর গল্প যে জানত মহিলা! আমাকে শোনাত। ব্ল্যাক ফরেস্টে রত্নদানো আর বামনেরা বাস করে, ওই মহিলাই প্রথম বলেছে আমাকে। বড় হয়ে তার মুখে শোনা অনেক গল্প নিজের মত করে লিখেছি। একটা বই উপহার দিয়েছিল আমাকে মহিলা। বইটা জার্মান ভাষায় লেখা। হয়ত বুঝবে না তোমরা, কিন্তু ছবি বুঝতে কোন অসুবিধে নেই। নিয়ে আসছি বইটা।'

উঠে গিয়ে শেলফ থেকে চামড়ায় বাঁধাই করা মোটা, পুরানো একটা বই নিয়ে এলেন মিস ভারনিয়া। 'প্রায় দেড়শো বছর আগে জার্মানীতে ছাপা হয়েছিল এ-বই।' ছেলেরা ঘিরে বসলে এক এক করে পাতা উল্টাতে শুরু করলেন তিনি। লেখক অনেক দিন বাস করেছেন ব্ল্যাক ফরেস্টে। রত্নদানো, বামন আর খাটোভূতদের নাকি তিনি দেখেছেন। নিজের হাতে ছবি এঁকেছেন ওগুলোর। 'এই যে, এই ছবিটা দেখ।'

পুরো পৃষ্ঠা জুড়ে একটা ড্রইং। কুৎসিত চেহারার একটা মানুষ যেন। মাথায় চূড়া আর বারান্দাওয়ালা চামড়ার টুপি, হাত-পায়ে বড় বড় রোম। কাঁধে ধরে রেখেছে একটা ছোট গাঁইতি। লাল চোখ, যেন জ্বলছে। রেগে আছে যেন কোন কারণে।

'ঠিক একটা···মানে এই চেহারাই দেখেছি জানালায়!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন।

'লেখক এর নাম দিয়েছেঃ রত্নদানোর দুষ্ট রাজা!' বলে গেলেন মিস ভারনিয়া। 'কিছু কিছু রত্নদানো আছে, যারা খুবই খারাপ। তবে ভাল রত্নদানোও আছে। যারা খারাপ, লেখকের মতে, তাদের চোখ লাল হয়ে যায়।'

'খাইছে!' বিড়বিড় করল মুসা।

'খারাপটাকেই দেখেছি তাহলে!' আপনমনেই বলল রবিন। রত্নদানো সত্যিই দেখেছে, এই বিশ্বাস আবার ফিরে আসছে তার।

পাতা উল্টে সাধারণ পোশাক পরা আরও কিছু রত্নদানোর ছবি দেখালেন মিস ভারনিয়া। 'ঠিক এই ধরনের পোশাক পরা রত্নদানো দেখেছি আমি কয়েকটা,' আস্তে বইটা বন্ধ করে রেখে দিলেন তিনি। 'ছবি তো দেখাই আছে, তাই ব্যাটাদেরকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে চিনেছি। যা যা ঘটেছে, সবই বলব। তবে আগে অন্যান্য কথা কিছু বলে নিই। পুরানো দিনের কথা, যখন খোকা-খুকুদের জন্যে আমি লিখতাম।' দীর্ঘশ্বাস পড়ল লেখিকার, অতীতের সোনালি দিনগুলোর কথা

মনে পড়ে যাওয়াতেই বোধহয়। 'অল্প বয়েস থেকেই লিখতে শুরু করি আমি। বাবা-মা মারা গেলেন, তখন নামডাক ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে আমার। ভাল পয়সা আসতে শুরু করল। এসব অনেক আগের কথা, তোমাদের জন্মও হয়নি তখন। আমার বাড়ি খুঁজে বের করত বাচ্চারা, আমার সঙ্গে আলাপ করতে আসত, আমার সই নিতে আসত। বাচ্চাদেরকে ভালবাসি আমি, তাই আশপাশের বাড়ির যত বাচ্চা ছিল, সবাই ছিল আমার বন্ধু। ধীরে ধীরে সময় বদলাল, পরিবেশ বদলাল। পুরো অঞ্চলটা বদলে গেল কি করে, কি করে জানি! পুরানো বাড়িঘর সব ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়া হল, ভাল ভাল গাছপালা কেটে সাফ করে ফেলা হল, বসত বাড়ির জায়গায় দিনকে দিন গজিয়ে উঠতে লাগল দোকানপাট। আমার বাচ্চা বন্ধুরা যেন হুড়মুড় করে বড় হয়ে গেল, কে যে কোথায় চলে গেল তারপর, জানি না। অনেকেই আমাকে এখান থেকে সরে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে, কিন্তু পারলাম না। কিছুতেই এই পরিচিত বাড়িটা বিক্রি করে যেতে পারলাম না। যাবও না। যতদিন বাঁচব, এখানে, এই বাড়িতেই থাকব। এখানে কেন পড়ে আছি, বোঝাতে পেরেছি তোমাদেরকে?'

তিনজনেই মাথা নোয়াল একবার।

'বদলেই চলেছে সবকিছু,' আবার বললেন মিস ভারনিয়া। 'বেশ কয়েক বছর আগে বন্ধ হয়ে গেছে থিয়েটারটা। ফলে লোক সমাগমও অনেক কমে গেছে আগের চেয়ে, প্রায় নির্জনই বলা চলে এখন অঞ্চলটাকে। গেটে কার্ড লাগিয়ে দিয়েছি আমি। পুরানো বন্ধুদের কেউ যদি কখনও আসে, শিস দিয়ে আমাকে ডাকবে। এটাই নিয়ম ছিল, এভাবেই ডাকত আমার রত্নদানো, বামন আর খাটোভূতেরা।' লেখিকার চোখের কোণ টলমল করছে। 'জান, এখনও কালেভদ্রে ওদের কেউ না কেউ আসে, শিস দিয়ে ডাকে আমাকে। ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিই। কিন্তু আগের সেই নিষ্পাপ ফুলগুলোকে আর দেখি না! ওরা আজ অনেক বড়!' চুপ করলেন মিস ভারনিয়া।

চুপ করে রইল তিন গোয়েন্দা।

'যাব না যাব না, বলছি বটে, কিন্তু যাবার দিন হয়ত এসে গেছে আমার,' বললেন মিস ভারনিয়া। 'আমাকে সরে যেতে বাধ্য করবে ওরা। ইতিমধ্যেই কয়েকবার প্রস্তাব নিয়ে এসেছে মিস্টার রবার্ট। আমার জায়গাটা কিনে নিতে পারলে তার সুবিধে হয়। কিন্তু মুখের ওপর মানা করে দিয়েছি। ওরা বুঝতে পারে না, আমি এখানে জন্মেছি, বড় হয়েছি, জীবনের সোনালি দিনগুলো আমার এখানেই কেটেছে, এই জায়গা ছেড়ে আমি কি করে যাই? আমার খাটোভূতদের স্মৃতি যে জড়ানো রয়েছে এর প্রতিটি ইঁটকাঠে!'

মহিলাকে বাড়ি ছাড়া করতে খুব কষ্ট হবে মিস্টার রবার্টের, বুঝতে পারল তিন গোয়েন্দা। আদৌ পারবে কিনা, তাতেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

আরেক কাপ চা ঢেলে নিলেন মিস ভারনিয়া। 'আমার অতীত নিয়ে বড় বেশি বকবক করে ফেলেছি, না? হয়ত তোমাদের খারাপ লাগছে। কিন্তু কতদিন পর মন খুলে কথা বলার সুযোগ পেয়েছি! উহ্, কতদিন!' কাপে চুমুক দিলেন তিনি। 'থাক এখন ওসব কথা। কাজের কথায় আসি। মাত্র কয়েক রাত আগে, হ্যাঁ, মাত্র কয়েক রাত। রত্নদানোদের দেখেছি আমি। না না, আমার বাচ্চা বন্ধু নয়, সত্যিকারের দানো!'

'খুলে বলুন, প্লীজ,' অনুরোধ করল কিশোর। 'রবিন, নোট নাও।'

পকেট থেকে নোটবই আর পেন্সিল বের করল রবিন।

'বয়েস হয়েছে,' বললেন মিস ভারনিয়া। 'কিন্তু ঘুম ভালই হয় আমার এখনও। কয়েক রাত আগে, অদ্ভুত একটা শব্দ শুনে মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। নরম মাটিতে গাঁইতি চালাচ্ছে যেন কেউ, এমনি শব্দ।'

'মাঝরাত? গাঁইতি?' ভুরু কুঁচকে বলল কিশোর।

'হ্যাঁ। প্রথমে ভেবেছি, ভুল শুনেছি। রাত দুপুরে মাটি কাটতে আসবে কে? একমাত্র...'

'...রত্নদানোরা ছাড়া!' বাক্যটা সমাপ্ত করে দিল মুসা।

'হ্যাঁ, রত্নদানো ছাড়া!' মাথা ঝাঁকালেন মিস ভারনিয়া। 'উঠে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম! ও-মা! আঙিনায় চারটে খুদে মানুষ! একেবারে ছবিতে যে রকম দেখেছি, তেমনি পোশাক পরা। লাফাচ্ছে ওরা, নাচানাচি করছে, খেলছে আনন্দে! ডাকলাম। সঙ্গে সঙ্গে ভোজবাজির মত গায়েব হয়ে গেল জীবগুলো!' ছেলেদের মুখ দেখে বোঝার চেষ্টা করলেন লেখিকা, তাঁর কথা বিশ্বাস করছে কিনা ওরা। 'আমি স্বপ্ন দেখিনি। পরের দিন পরিচিত এক কনস্টেবলকে রাস্তায় দেখে তাকে ডেকে বললাম সব কথা। কি একখান চাউনি যে দিল আমাকে! আহ্, যদি দেখতে!' ক্ষণিকের জন্যে ঝিক করে উঠল মহিলার নীল চোখের তারা। আমাকে উপদেশ দিল ব্যাটা! নিজের শরীরের প্রতি খেয়াল রাখতে বলল। শিগগিরই বাইরে কোথাও গিয়ে বেড়িয়ে আসতে বলল। ওকেও আচ্ছামত কথা শুনিয়েছি আমি। ওর সামনেই প্রতিজ্ঞা করেছি, রত্নদানোর কথা আর কক্ষণো বলব না পুলিশকে।'

এক মুহূর্ত চুপ থেকে হঠাৎ হেসে উঠলেন মিস ভারনিয়া। 'আসলে পুলিশেরও দোষ দেয়া উচিত না। রাতদুপুরে রত্নদানো দেখেছি, একথা বললে কে বিশ্বাস করতে চাইবে? যাই হোক, সেদিন জোর করেই মনকে বোঝালাম, রত্নদানো দেখিনি। ওসব আমার কল্পনা। দ্বিতীয় রাত গেল, কিছু ঘটল না। তৃতীয় রাতে আবার দেখলাম ওদের। একই সময়ে, একই জায়গায়। তাড়াতাড়ি ফোন করে বললাম আমার এক ভাইপোকে। বব, আমার একমাত্র ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। বিয়ে করেনি এখনও, মাইল কয়েক দূরে একটা অ্যাপার্টমেন্ট নিয়ে থাকে সে। ওকে অনুরোধ করলাম আসতে। অবাক হল, কিন্তু আসবে বলে কথা দিল। ভাঁড়ারে

দানোদের হুটোপুটির আওয়াজ পেলাম। টর্চটা নিয়ে পা টিপে টিপে নিচে নামলাম, এগোলাম ভাঁড়ারের দিকে। যতই এগোলাম, শব্দ আরও স্পষ্ট হতে থাকল। ঘরে ঢুকেই টর্চের সুইচ টিপে দিলাম। কি দেখলাম জান?'

মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছে তিন ছেলে। একই সঙ্গে বলে উঠল, 'কী!'

তিনজনের দিকেই একবার করে তাকালেন মিস ভারনিয়া। স্বর খাদে নামিয়ে বললেন, 'কিচ্ছু না!'

চেপে রাখা শ্বাস শব্দ করে ছাড়ল রবিন। পুরোপুরি হতাশ হয়েছে।

'হ্যাঁ, প্রথমে কিচ্ছু না!' আবার বললেন মিস ভারনিয়া। 'টর্চ নিভিয়ে দিলাম। আবার ওপরে উঠে যাওয়ার জন্যে ঘুরতেই দেখলাম ওটাকে। ছোট একটা মানুষের মত জীব, ফুট তিনেক লম্বা। চামড়ার টুপি, চামড়ার কোট-প্যান্ট, চোখা মাথাওয়ালা জুতো। নোংরা দাড়ি, বোধহয় মাটি লেগেছিল। এক হাতে একটা গাঁইতি কাঁধে ধরে রেখেছে, আরেক হাতে মোমবাতি। মোমের আলোয় ওর চোখ দেখতে পেলাম, টকটকে লাল, যেন জ্বলছে!'

'ঠিক! ওই ব্যাটাকেই খানিক আগে দেখেছি আমি!' আবার চেঁচিয়ে উঠল রবিন।

'রত্নদানো। কোন সন্দেহ নেই,' সায় দিয়ে বললেন মিস ভারনিয়া।

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। গভীর চিন্তায় মগ্ন।

'তারপর?' হঠাৎ প্রশ্ন করল গোয়েন্দাপ্রধান।

কাপে চুমুক দিলেন মিস ভারনিয়া, অল্প অল্প কাঁপছে তাঁর হাত। 'আমার দিকে চেয়ে ফোঁসে উঠল দানোটা। গাঁইতি বাগিয়ে শাসাল। তারপর এক ফুঁয়ে বাতি নিভিয়ে দিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দড়াম করে বন্ধ হল দরজার পাল্লা। ছুটে গেলাম দরজার কাছে। বন্ধ! বাইরে থেকে আটকে দেয়া হয়েছে। ভাঁড়ারে আটকা পড়লাম আমি!'

কিছু একটা বলার জন্যে মুখ খুলল মুসা, থেমে গেল। ঘরের দূর প্রান্তে ঝনঝন শব্দ উঠল। আলোচনায় এতই মগ্ন ছিল ওরা, চমকে উঠল ভীষণ ভাবে।

ছয়

'সর্বনাশ!' কণ্ঠস্বরে মনে হল মিস ভারনিয়ার গলা চেপে ধরেছে যেন কেউ। 'হল কি?...আরে! আমার ছবিটা পড়ে গেছে।'

ছুটে গেল তিন গোয়েন্দা। মেঝেতে পড়ে আছে সোনালি ধাতব ফ্রেমে বাঁধাই করা একটা বড়সড় ছবি। ছবিটা চিৎ করল কিশোর। মিস ভারনিয়ার সুন্দর একটা ছবি, তরুণী ছিলেন তখন তিনি।

'আমার বইয়ের ছবি আঁকত যে শিল্পী,' বললেন লেখিকা, 'সে-ই এই ছবিটা

এঁকে দিয়েছিল।'

ছবিতে ঘাসের ওপর বসে বই পড়ছেন মিস ভারনিয়া, তাঁকে ঘিরে বসে আছে ছোট ছোট ছেলেমেয়ের দল, লেখিকার 'রত্নদানো', 'বামন', আর 'খাটোভূত'।

ওপর দিকে তাকাল কিশোর। ছাতের হুক থেকে ঝুলছে একটা সরু শেকল, ওটাতেই ঝোলানো ছিল ছবিটা। কোন কারণে শেকল ছিঁড়ে পড়েছে, ফ্রেমের সঙ্গে লাগানো আছে শেকলের ছেঁড়া একটা অংশ।

ছেঁড়া মাথাটা ভালমত পরীক্ষা করল কিশোর, মুখের ভাব বদলে গেল। 'মিস ভারনিয়া, শেকলটা ছিঁড়ে পড়েনি। লোহাকাটা করাত দিয়ে কেটে রাখা হয়েছিল এমন ভাবে, যাতে ছবিটা ঝুলে থাকে কিছুক্ষণ, তারপর বাতাসে বা অন্য কোনভাবে নাড়া লাগলেই খসে পড়ে।'

'বল কি!' রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছলেন লেখিকা। 'রত্নদানো! নিশ্চয় রত্নদানোর কাজ! যে রাতে···ও, এখনও আসিনি সে-কথায়।'

'শেকল জোড়া লাগিয়ে আবার ঝুলিয়ে দিচ্ছি ছবিটা। কাজ করতে করতে আপনার কথা শুনব।···ও হ্যাঁ, প্লায়ার্স আছে?'

'আছে।'

কিশোর আর মুসা শেকল জোড়া লাগাতে বসে গেল। মিস ভারনিয়া তাঁর কাহিনী বলে গেলেন, নোট নিতে থাকল রবিন।

সে-রাতে ভাঁড়ারে আটকা পড়েছিলেন মিস ভারনিয়া। তাঁর ভাইপো এসে দরজার ছিটকিনি খুলে তাঁকে উদ্ধার করল। ফুফুর কাহিনী মন দিয়ে শুনল বব, কিন্তু এক বিন্দু বিশ্বাস করল না। অবশেষে আস্তে করে বলল, কোন চোর-টোর ঢুকেছিল বাড়িতে, সে-ই দরজা আটকে দিয়েছে।···

'এক মিনিট, ভারনিয়া,' হাত তুলল কিশোর। 'ছবিটা আবার তুলে দিই, তারপর শুনব বাকিটা।'

একটা চেয়ারে উঠে দাঁড়াল মুসা। ছবিটা তার হাতে তুলে দিল কিশোর। রবিন দেখল, হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে কিশোরের মুখ। এই উজ্জ্বলতার কারণ জানে নথি। নিশ্চয় কোন বুদ্ধি এসেছে গোয়েন্দাপ্রধানের মাথায়।

'কি হল, কিশোর?' কাছে গিয়ে মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল রবিন।

শেকল জোড়া লাগিয়ে ছবিটা আবার আগের জায়গায় ঝুলিয়ে দিয়ে চেয়ার থেকে নেমে এল মুসা।

রবিনের দিকে চেয়ে হাসল কিশোর। 'মনে হয় গোল্ডেন বেল্ট রহস্যের কিনারা করে ফেলেছি,' ফিসফিস করে বলল।

'তাই। বল, বল!' চেঁচিয়ে উঠতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিল রবিন। 'কি করে কোন পথে চুরি করল?'

'পরে, এখন বলার সময় না। মিস ভারনিয়ার কথা শেষ হয়নি এখনও, সেটা শুনি আগে।'

হতাশ হল রবিন। জানে, এখন আর চাপাচাপি করে লাভ নেই। কিশোরের সময় না হলে সে কিছুই বলবে না। মিস ভারনিয়ার ছবিটার দিকে চেয়ে বোঝার চেষ্টা করল কি করে চুরি হয়েছে গোল্ডেন বেল্ট, কিছুই বুঝতে না পেরে হাল ছেড়ে দিল। আবার গিয়ে আগের জায়গায় নোট লিখতে বসল।

'ওর অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে আমাকে রাতে থাকতে বলল বব,' আবার শুরু করলেন মিস ভারনিয়া। 'রাজি হলাম না। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল বব, রত্নদানোরা আর এল না। রহস্যজনক শব্দও হল না। শেষে চলে গেল সে। সে-রাতে আর কিছুই ঘটল না। পরের রাতে আবার রহস্যময় শব্দ শুনলাম। একবার ভাবলাম, ববকে ফোন করি, কিন্তু আগের রাতে তার হাবভাব যে-রকম দেখেছি, আর ডাকতে ইচ্ছে হল না। পা টিপে টিপে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলাম নিচের তলায়। লাইব্রেরিতে খুটখাট ধুপধাপ শব্দ হচ্ছে। গিয়ে উঁকি দিলাম। আমার সমস্ত বই মেঝেতে ছড়ানো-ছিটানো, কয়েকটা ছবি খুলে নিয়ে ফেলে রাখা হয়েছে বইয়ের স্তূপের ওপর। যত রকমে সম্ভব, আমাকে বিরক্ত করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে যেন রত্নদানোরা। মনে হয়, ওই রাতেই শেকলটা করাত দিয়ে কেটেছে ওরা।

'খুব দমে গেলাম। ববকে ফোন করলাম পরদিন সকালে। লাইব্রেরির অবস্থা দেখল সে, কিন্তু রত্নদানোরা করেছে, এটা কিছুতেই বিশ্বাস করল না। কায়দা করে বেশ ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দোষটা আমার ওপরই চাপিয়ে দিল। ঘুমের ঘোরে আমি নিজেই নাকি লাইব্রেরিতে ঢুকে এই কাণ্ড করেছি। আমার মাথায় গোলমাল হয়েছে, আকারে-ইঙ্গিতে এ-কথাও বলল। কোন ভাল জায়গায় গিয়ে ক'দিন ভালমত বিশ্রাম নেয়ার পরামর্শ দিল। বিরক্ত হয়ে শেষে তাকে বকাটকা দিয়ে বের করে দিলাম। আমি জানি আমি কি করেছি, কি দেখেছি। আমি জানি, ঘুমের ঘোরে দুঃস্বপ্ন দেখিনি। কিন্তু এসবের মানে কি, কিছুই বুঝতে পারছি না।' এক হাত দিয়ে আরেক হাত মুচড়ে ধরলেন মিস ভারনিয়া। 'কি মানে? কেন ঘটছে এসব? আমার ওপর রত্নদানোরা খেপে গেল কেন হঠাৎ?'

প্রশ্নগুলোর জবাব মুসা আর রবিনও জানে না। অবিশ্বাস্য এক গাঁজাখুরি গল্প, কিন্তু মিস ভারনিয়া যে মিছে কথা বলছেন না, এটাও ঠিক, অন্তত তাদের তাই মনে হচ্ছে।

প্রশ্নগুলোর জবাব কিশোরেরও জানা নেই। অনেকক্ষণ ভেবে নিয়ে বলল, 'এখন আমাদের প্রথম কাজ, রত্নদানোর অস্তিত্ব সম্পর্কে শিওর হওয়া। কেন আপনাকে বিরক্ত করছে ওরা, সেটা পরে জানা যাবে।'

'বেশ, যা ভাল বোঝ কর,' হাতের তালু দিয়ে তালু চেপে ধরলেন মিস ভারনিয়া।

'ফাঁদ পাততে হবে ব্যাটাদের জন্যে,' বলল কিশোর।

'ফাঁদ?' সামনে ঝুঁকল মুসা। 'কিসের ফাঁদ?'

'রত্নদানোদের জন্যে। আজ রাতটা আমরা যে-কেউ একজন এখানে কাটাব, রত্নদানো ধরার চেষ্টা করব।'

'কে থাকছে?'

'তুমিই থাক।'

'দাঁড়াও!' হাত তুলল মুসা। 'আমি টোপ হতে চাই না। রত্নদানো আছে বলে বিশ্বাস করি না, কিন্তু ঝুঁকি নেয়ারও ইচ্ছে নেই আমার।'

'কিন্তু তুমি থাকলেই ভাল হয়। তোমার গায়ে সিংহের জোর, একবার যদি আঁকড়ে ধরতে পার, রত্নদানোর সাধ্যি নেই ছাড়া পায়। তুমিই থাক, মুসা।'

প্রশংসায় গলে গেল মুসা। তবু আমতা আমতা করল, 'কিন্তু একা···রবিন থাকলে···'

'না না, আমি পারব না,' তাড়াতাড়ি বলে উঠল রবিন। 'আজ রাতে আমার খালাম্মা বেড়াতে আসবে। আমাকে থাকতেই হবে বাড়িতে। কাজেই আমি বাদ।'

'তোমার তো আজ কোন কাজ নেই, কিশোর,' বলল মুসা। 'আগামী কাল রোববার, ইয়ার্ড বন্ধ। কালও কোন কাজ নেই। তুমিই থাক না আমার সঙ্গে?'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। মাথা কাত করল। 'ঠিক আছে, থাকব। একজনের জায়গায় দু'জন, বরং ভালই হবে। মিস ভারনিয়া, আমরা থাকলে আপনার কোন অসুবিধে হবে?'

'না না, অসুবিধে কি?' খুশিতে উজ্জ্বল হল লেখিকার মুখ। 'বরং ভালই লাগবে। সিঁড়ির মাথায় একটা ঘর আছে, ওখানে থাকতে পারবে। তোমাদের খারাপ লাগবে কিনা সেটা বল। সাংঘাতিক কোন বিপদে না আবার পড়ে যাও।'

'রত্নদানোরা বিপদে ফেলবে বলে মনে হয় না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'এ পর্যন্ত আপনার গায়ে হাত তোলেনি ওরা, দূর থেকেই ভয় দেখানর চেষ্টা করেছে শুধু। আমাদেরও ক্ষতি করবে বলে মনে হয় না। আজ রাতে ওদের একটাকে ধরার চেষ্টা করব! রাতের অন্ধকারে ফিরে এসে অপেক্ষা করব আমরা। বেরোব হৈ-হট্টগোল করে, ফিরব চুপে চুপে, যাতে কেউ না দেখে।'

'ভাল বুদ্ধি!' সায় দিলেন মিস ভারনিয়া। 'তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করব আমি। শুধু একবার বেল বাজাবে, গেটের তালা খুলে দেব।'

হৈ-চৈ করে মিস ভারনিয়ার বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা। আড়াল থেকে তাদের ওপর কেউ চোখ রেখে থাকলে, সে নিশ্চয় দেখতে পেয়েছে।

গেটের বাইরে এসেই প্রশ্ন করল মুসা, 'কিশোর, সব কিছুই মহিলার অনুমান নয়ত?'

'জানি না,' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল গোয়েন্দাপ্রধান। 'হতেও পারে। কিন্তু

মহিলার ব্যবহারে মনে হল না মাথায় কোন গোলমাল আছে। হয়ত সত্যিই রত্নদানোদের দেখেছেন!'

'দূরর্! রত্নদানো থাকলে তো দেখবে?'

'থাকতেও পারে। লোকে তো বিশ্বাস করে!'

'লোকে তো ভূতও বিশ্বাস করে।'

জবাব দিল না কিশোর।

রবিন বলল, 'বিশ্বাস অনেক সময় সত্যিও হয়ে যায়। ১৯৩৮ সালে আফ্রিকার উপকূলে একটা আজব মাছ ধরা পড়েছিল। তার আগে বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল, কোটি কোটি বছর আগে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে ওই মাছ। কোয়েলাকান্থ ওর নাম। একটা দুটো নয়, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোয়েলাকান্থ বেঁচে আছে আজও, ঘুরে বেড়াচ্ছে সাগরের তলায়। তাহলে?' লেকচার দেয়ার সুযোগ পেয়ে গেছে রবিন। 'ধর, অনেক অনেক বছর আগে হয়ত বামন মানুষেরা পৃথিবীতে রাজত্ব করত। তারপর একদিন এল লম্বা মানুষেরা, ওদের ভয়ে ছোট মানুষেরা গিয়ে লুকাল মাটির তলায়। অনেকেই মরে গেল, কিন্তু কেউ কেউ মাটির তলায় বাস করাটা রপ্ত করে নিল। ব্যস, টিকে গেল ওরা; হয়ত কোয়েলাকান্থের মতই আজও টিকে আছে ওরা। তাদের নাম রত্নদানো কিংবা বামন কিংবা খাটোভূত হতে দোষ কি?'

'চমৎকার থিওরি' হাসল কিশোর। 'দেখা যাক, আজ রাতে রত্নদানো ধরা পড়ে কিনা। পৃথিবী-বিখ্যাত হয়ে যাব আমরা রাতারাতি।'

পথে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে কেবল কিশোর।

অধৈর্য হয়ে উঠল মুসা। 'কী দাঁড়িয়ে আছ চুপচাপ! চল বাড়ি যাই। খিদে পেয়েছে।'

'তোমার পেটে রাক্ষস ঢুকেছে!' সহকারীকে মৃদু ধমক দিল গোয়েন্দাপ্রধান! 'এস, আগে পুরো ব্লকটা ঘুরে দেখি। পাতাবাহার আর কাঠের বেড়া শুধু ভেতর থেকে দেখেছি, বাইরে থেকে একবার দেখি।'

'রত্নদানোরা কোন পথে বেরোয়, সেটা দেখতে চাইছ?' রবিন বলল।

'হ্যাঁ। তখন তাড়াহুড়োয় হয়ত চোখ এড়িয়ে গেছে। ভাল করে দেখলে পথটা পেয়েও যেতে পারি।'

থিয়েটার বাড়ির এক পাশ থেকে শুরু করল ওরা। খিদের কথাটা আকারে-ইঙ্গিতে আরেকবার জানাল মুসা। হেসে ফেলল কিশোর আর রবিন। শিগগিরই বাড়ি যাবে, কথা দিয়ে, কাজ শুরু করল কিশোর।

থিয়েটারের সদর দরজা তক্তা লাগিয়ে আটকে দেয়া হয়েছে। তার ওপর লাগানো হয়েছে কন্ট্রাকটরের সাইনবোর্ড। মোড় ঘুরে সরু গলিপথটায় এসে ঢুকল তিন গোয়েন্দা, মিস ভারনিয়ার বাড়ির পেছন দিয়ে যেটা গেছে সেটাতে। খানিক

দূর এগিয়েই এক পাশে একটা লোহার গেট পড়ল, থিয়েটার বাড়ির পেছনের গেট। পাল্লা কয়েক ইঞ্চি ফাঁক হয়ে আছে, তারমানে খোলা। ভেতর থেকে হঠাৎ ভেসে এল মানুষের গলা।

'আশ্চর্য তো!' গেটের পাল্লায় লাগানো বোর্ডের দিকে চেয়ে আছে কিশোর। 'নোটিশ ঝুলিয়েছে বন্ধ, অথচ খোলা!'

'নিশ্চয় ভূতেরা কথা বলছে,' বিড় বিড় করে বলল মুসা। 'নইলে এখানে মরতে আসবে কে? এই সময়?'

সঙ্গীদের নিয়ে গেট ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ল কিশোর। সিঁড়ি, তারপর আরেকটা দরজা। দরজার কপালে লেখা 'স্টজভোর'। রঙ চটে গেছে, কিন্তু পড়া যায়।

পাথরের সিঁড়িতে বসে পড়ল কিশোর। ভেতর থেকে আর কথা শোনা যায় কিনা তার অপেক্ষা করছে। একবার খুলছে আবার বাঁধছে জুতোর ফিতে। দু'জন মানুষের চাপা গলায় কথা শোনা গেল আবার।

'শুনছ...' শুরু করেই থেমে গেল মুসা।

'শ্‌শ্‌শ্‌!' ঠোঁটে আঙুল রাখল কিশোর। ফিসফিস করে বলল, 'গোল্ডেন বেল্ট শব্দটা বুঝতে পেরেছি!'

'গোল্ডেন বেল্ট! মানে...' বলতে গিয়ে বাধা পেল রবিন।

'আস্তে!' কান খাড়া করে ঘরের ভেতরের কথা বোঝার চেষ্টা করছে কিশোর। 'মিউজিয়ম শব্দটাও শুনলাম!'

'ইয়াল্লা!' ফিসফিস করল মুসা, চোখ বড় বড় হয়ে গেছে। 'কি খুঁজতে এসে কি পেয়ে যাচ্ছি! পুলিশ ডেকে আনব নাকি?'

'ভালমত বুঝে নিই, তারপর ডাকা যাবে,' উঠে গিয়ে দরজায় কান পাতল কিশোর।

রবিন আর মুসাও এসে দাঁড়াল দরজার কাছে। আবার 'মিউজিয়ম' শব্দটা বলা হল, এবার শুনল তিনজনেই। গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে দরজায় কান পাতল ওরা। পাল্লা ভিড়িয়ে রাখা হয়েছে শুধু, ঠেলা লাগল, খুলে গেল হাঁ হয়ে। বেশি হেলে ছিল কিশোর, হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল সে। পড়ার আগে মুসার কাপড় খামচে ধরে পতন রোধের চেষ্টা করল, পারল তো না-ই, মুসার ভারসাম্যও নষ্ট করে দিল। গোয়েন্দা সহকারীও পড়ল, এবং পড়ল রবিনকে নিয়ে।

হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে দাঁড়ানর চেষ্টা করল ওরা। ঠিক এই সময় মুসা আর রবিনের কলার চেপে ধরল ভারি থাবা। 'চোর!' গর্জে উঠল লোকটা। 'মিস্টার রবার্ট, চোর! কয়েকটা ছেলে ঢুকেছে চুরি করতে!'

সাত

গাঁট্টাগোট্টা একজন লোক। কালো ঘন ভুরু। চোখ মুখ পাকিয়ে রেখেছে। কলার ধরে টেনে তুলল সে রবিন আর মুসাকে। 'ব্যাটারা! এইবার পেয়েছি! মিস্টার রবার্ট, আরেকটা রয়েছে! জলদি এসে ধরুন!'

'কিশোর, পালাও!' চেঁচিয়ে বলল মুসা। 'বোরিসকে নিয়ে এস!'

পালাল না কিশোর, দাঁড়িয়ে রইল। 'ভুল করছেন আপনি,' নিরীহ গলায় লোকটাকে বলল সে। 'খালি বাড়িতে কথার আওয়াজ পেয়ে অবাক লাগল, তাই দেখতে এসেছি। আমরাই বরং ভেবেছি, চোর ঢুকেছে।'

'তাই, না?' কড়া চোখে লোকটা তাকাল কিশোরের দিকে। 'চোর ঢুকেছে ভেবেছ?'

যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না, এমনি চেহারা করে দাঁড়িয়ে রইল কিশোর।

আরেকজন এসে দাঁড়াল, রোগা শরীর, পাতলা চুল। 'আরে বার্ট, কি করছ? খালি বাড়ি, তাই সন্দেহ হয়েছে ওদের। হতেই পারে।'

'ওদের ভাবসাব পছন্দ হচ্ছে না আমার, মিস্টার রবার্ট!' বার্টের গলায় সন্দেহ।

'আচ্ছা দাঁড়াও, আমি কথা বলছি,' এগিয়ে এল দ্বিতীয় লোকটা। 'আমি জন রবার্ট। এই বাড়ির মালিক। ভাঙচুর চলছে, নতুন করে বাড়ি তৈরি করব, তাই মাঝে মাঝে দেখতে আসি। এ হল বার্ট ইঅং, আমার দারোয়ান। তা তোমাদের কেন সন্দেহ হল ভেতরে চোর ঢুকেছে?'

'গেটে তালা...' শুরু করল কিশোর, কিন্তু তার কথার মাঝেই বলে উঠল মুসা, 'গোল্ডেন বেল্ট শব্দটা কানে এল! সন্দেহ জাগল আমাদের। আরও ভালমত কান পাতলাম, মিউজিয়ম শব্দটাও শুনলাম। ধরেই নিলাম বেল্ট চুরি করে এখানে ঢুকেছে চোরেরা!'

'মিস্টার রবার্ট,' গম্ভীর গলায় বলল ইঅং। 'ছেলেগুলোর মাথায় হয় গোলমাল আছে, নইলে চোর। আমি যাই, পুলিশ নিয়ে আসি।'

'থাম!' ধমক দিল রবার্ট। 'তুমি কি বোঝ?...আচ্ছা, গোল্ডেন বেল্ট...!' হঠাৎ কি মনে পড়ে যাওয়ায় হাসল সে। 'অ-অ, বুঝেছি! মনে পড়েছে। আমি আর বার্ট পরামর্শ করছিলাম থিয়েটারটা ভেঙে ফেলার আগেই গোল্ড অ্যাণ্ড গিল্টগুলো সরিয়ে ফেলব। সোনালি রঙ করা কিংবা গিলটি করা অনেক কারুকাজ, অনেক নকশা রয়েছে এখানে, একেবারে মিউজিয়মের মত মনে হয়। গোল্ড অ্যাণ্ড গিল্টকেই তোমরা গোল্ডেন বেল্ট শুনেছ। বুঝতে পারছি, গোল্ডেন বেল্ট চুরির ব্যাপারটা নিয়ে বেশি মাথা ঘামাচ্ছ তোমরা।' হাসল সে।

গোমড়া মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে ইঅং। 'খুব বেশি কল্পনা করে বিচ্ছুগুলো।'

'তোমার কি?' কড়া গলায় বলল রবার্ট। 'খাও আর ঘুমাও। কল্পনা করবে কখন? কোন কিছু তোমাকে নাড়া দেয় নাকি? এই যে গত কয়েক রাতে কি সব শব্দ হল, ভয়ে পালাল দু'জন নাইট গার্ড, কেন কি হল, একবারও ভেবেছ?'

'শব্দ?' আগ্রহী হয়ে উঠল কিশোর। 'কেমন শব্দ?'

'কি জানি! ওরা বলল, ভূতে নাকি দরজায় টোকা দেয়, গোঙায়,' বলল রবার্ট। 'আসলে, বাড়িটা পুরানো, ঢুকলে এমনিতেই গা ছমছম করে। অন্ধকারে নানারকম শব্দ হয়। কেন হয় দেখতে চাও? এস আমার সঙ্গে। গোল্ড অ্যাণ্ড গিল্টও দেখতে পাবে। দেখবে?'

তিনজনই বলল, দেখবে।

'বার্ট, মেইন লাইনটা দিয়ে দাও তো। এস, তোমরা আমার সঙ্গে এস।' আগে আগে অন্ধকার একটা গলি ধরে এগোল রবার্ট। পেছনে অনুসরণ করল ছেলেরা।

অন্ধকারে কিছু একটা রবিনের গাল ছুঁয়ে গেল, চেঁচিয়ে উঠল সে, 'বাদুড়!'

'হ্যাঁ,' অন্ধকার থেকে ভেসে এল রবার্টের গলা। 'অনেক বছর খালি পড়ে আছে বাড়িটা। বাদুড় আর ইঁদুরের আড্ডা! ওরাই রহস্যময় শব্দ করে। একেকটা ইঁদুর যা বড় না, বেড়াল খেয়ে ফেলতে পারবে!'

ঢোক গিলল রবিন, চুপ করে রইল। অসংখ্য বাদুড়ের ডানা ঝাপটানর শব্দ কানে আসছে। মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ কিচকিচ আওয়াজ হচ্ছে, শিরশির করে ওঠে গা।

হঠাৎ গাঁ ই-ই-চ করে উঠল কিসে যেন। চমকে উঠল ছেলেরা।

'ভয় পাচ্ছ?' অন্ধকারেই বলল রবার্ট। 'ও কিছু না। পর্দা টানার জন্যে, নানারকম সিনসিনারির ছবি ঝোলানর জন্যে পুলি আর মোটা দড়ি ব্যবহার হত, ছিঁড়ে গেছে বেশির ভাগই, পুলিতে মরচে পড়েছে। দড়িগুলোতে বাদুড় ঝুললেই টান পড়ে, বিচিত্র শব্দ হয়।...অহ্, এতক্ষণে আলো জ্বলল।'

মাথার ওপর বিশাল এক ঝাড়বাতি জ্বলে উঠেছে, সবুজ, লাল, হলুদ আর নীল কাচের ফানুসগুলোতে বালি যেন লেপটে রয়েছে। এমনিতেই কম পাওয়ারের বাল্ব ওগুলোর ভেতরে, তার ওপর বালিতে ঢাকা পড়ায় আলো তেমন ছড়াচ্ছে না। অদ্ভুত এক রঙিন আলো আঁধারীর সৃষ্টি হয়েছে হলের ভেতরে। আবছামত দেখা যাচ্ছে ঘরের জিনিসপত্র। এক প্রান্তে মস্তবড় মঞ্চ। চারপাশে শুধু সিট আর সিট। বিরাট থিয়েটার ছিল এককালে।

হলের দু'পাশের দেয়ালে বড় বড় জানালা, তাতে সোনালি সুতোয় নকশা করা লাল মখমলের ভারি পর্দা ঝুলছে। দেয়ালে দেয়ালে নানা রকমের চিত্র, নাইট আর সারাসেনদের লড়াইয়ের দৃশ্য, যোদ্ধাদের পরনে সোনালি বর্ম। ঠিকই বলেছে রবার্ট, গোল্ড অ্যাণ্ড গিল্ট-এর ছড়াছড়ি। হলের ভেতরের পরিবেশও মিউজিয়ামের মত।

'উনিশশো বিশ সালে তৈরি হয়েছিল এই থিয়েটার,' বলল রবার্ট। 'মূরেরা তৈরি করেছিল। এ-ধরনের জাঁকজমক তখন পছন্দ করত লোকে। বাইরে থেকে দেখেছ না, কেমন দুর্গদুর্গ লাগে? এটাও তখনকার দর্শকদের পছন্দ ছিল। আজকাল তো এসব জায়গায় লোকে ঢুকতেই চাইবে না, কেমন যেন দম বন্ধ হয়ে আসে!'

ফিরে যাওয়ার জন্যে ঘুরল রবার্ট। হঠাৎ একটা চেয়ারের হাতলে লাফিয়ে উঠল কালচে-ধূসর রোমশ একটা জীব, ছোটখাট একটা বেড়াল বললেই চলে।

'আমাদের একজন বাসিন্দা,' ইঁদুরটাকে দেখে হেসে বলল রবার্ট। 'অনেক বছর ধরে বাস করছে, তাড়াতে বহুত কষ্ট হবে।'

আগের ঘরটায় ফিরে এল ওরা। 'তারপর, মূরিশ থিয়েটারের ভেতর তো দেখলে। বাড়িটা ভাঙা হবে যেদিন, সেদিন এস। সে এক দেখার ব্যাপার। কয়েক হপ্তার মধ্যেই ভাঙব। গুডবাই, অ্যাঁ।'

ছেলেরা বাইরে বেরোতেই পেছনে বন্ধ করে দেয়া হল দরজা। ছিটকিনি তুলে দেয়ার শব্দ কানে এল ওদের।

'বাপরে বাপ!' ফোঁস করে শ্বাস ফেলে বলল মুসা। 'কি একেকখান ইঁদুর! বেড়াল কি, হাতিও খেয়ে ফেলবে! এ-জন্যেই পালিয়েছে নাইট গার্ডরা।'

'হ্যাঁ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল কিশোর। 'রহস্যময় শব্দের ভালই ব্যাখ্যা। গোল্ডেন বেল্ট আর মিউজিয়মের ব্যাপারটাও বেশ ভালই বোঝানো হয়েছে!' জিভ আর টাকরার সাহায্যে বিচিত্র শব্দ করল গোয়েন্দাপ্রধান। 'কিন্তুহ্...যাকগে, ওটা আমাদের কাজ নয়। আমরা এসেছি মিস ভারনিয়াকে সাহায্য করতে। চল, দেখাদেখির কাজটা শেষ করে ফেলি।'

গলিটা দেখল ওরা, ইঁটের দেয়াল আর কাঠের বেড়া পরীক্ষা করল, পাতাবাহারের বেড়ার প্রতিটি ইঞ্চি খুঁটিয়ে দেখল! রত্নদানো বেরোনর কোন পথই নেই।

'নাহ্, কিছু পাওয়া গেল না!' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে শুরু করেছে কিশোর। 'বুঝতে পারছি না!'

'এখন বোঝা যাবেও না!' মুখ বাঁকাল মুসা। 'খিদেয় পেট জ্বলছে, বাড়ি যাবে নাকি তাই বল?'

'হ্যাঁ, এখানে এখন আর কিছু করার নেই। চল, যাই।'

গভীর মনোযোগে খবরের কাগজ পড়ছে বোরিস। ছেলেরা গাদাগাদি করে বসল তার পাশে। কাগজটা ভাঁজ করে রেখে ইঞ্জিন স্টার্ট দিল সে।

বড় রাস্তায় এসে উঠল ট্রাক, ছুটে চলল দ্রুতগতিতে।

একটা প্রশ্ন কেবলই খোঁচাচ্ছে রবিনকে। গোল্ডেন বেল্ট কি করে চুরি হয়েছে? কিশোরকে জিজ্ঞেস করতে গিয়েও থেমে গেল রবিন। গভীর চিন্তায় মগ্ন

গোয়েন্দাপ্রধান। নিচের ঠোঁটে চিমটি কেটে চলেছে ঘনঘন। এখন তাকে প্রশ্ন করলেও জবাব পাওয়া যাবে না।

অগত্যা কৌতূহল চেপে চুপ করে রইল রবিন।

আট

রকি বীচে পৌঁছুল ট্রাক। স্যালভিজ ইয়ার্ডে ঢুকল।

ট্রাক থেকে সবার আগে নামল মুসা। 'এক্ষুণি বাড়ি যেতে হবে আমাকে। ভুলেই গিয়েছিলাম, আজ বাবার জন্মদিন। স্পেশাল খাবার রাঁধবে মা।'

'ঠিক আটটায় আসবে,' বলল কিশোর। 'বাড়িতে বলে এস, মিস্টার ক্রিস্টোফারের এক বান্ধবীর বাড়িতে রাতে থাকবে। আগামীকাল সকাল নাগাদ ফিরবে।'

'ঠিক আছে।' তাড়াতাড়ি সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে গেল মুসা।

ট্রাক থেকে কিশোরকে নামতে দেখে অফিস থেকে বেরিয়ে এলেন মেরিচাচী।

'এই যে কিশোর, এসেছিস,' বললেন চাচী। 'আধঘন্টা ধরে তোর সঙ্গে দেখা করার জন্যে ছেলেটা বসে আছে।'

'আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে! কে, চাচী?'

'নাম বলল মিরো মুচামারু। জাপানী, কিন্তু ভাল ইংরেজি বলে। কত কথা বলল আমাকে। মুক্তার কথা বলল। ট্রেনিং দেয়া ঝিনুক নাকি আছে, মুক্তা ফলানতে কাজে লাগে ওগুলো। আরও কত কথা!' হাসলেন মেরিচাচী।

মনে মনে কিশোর হাসল। ইয়ার্ডের কাজ করানর সময় চাচীর এই হাসি কোথায় থাকে, ভেবে অবাক হল সে। 'কই, চল তো দেখি? রবিন, এস।' হাঁটতে হাঁটতে বলল সে, 'চাচী, আজ রাতে মিস ভারনিয়ার বাড়িতে থাকতে হবে। কি সব শব্দ নাকি রাতে বিরক্ত করে মহিলাকে। আমি আর মুসা আজ রাতে পাহারা দেব ঠিক করেছি।'

'তাই নাকি!' কিশোরকে অবাক করে দিয়ে এক কথায় রাজি হয়ে গেলেন চাচী। 'ঠিক আছে, যাস। বোরিসকে ছেড়ে দিস, সকালে গিয়ে নিয়ে আসবে আবার।' কাচে ঘেরা অফিসের সামনে এসে ডাক দিলেন তিনি, 'মিরো, কিশোর এসেছে। এই রবিন, না খেয়ে যেয়ো না কিন্তু। আধ ঘন্টার মধ্যেই হয়ে যাবে। হ্যাঁ-রে কিশোর, মুসাকে দেখছি না?'

'ওর বাবার জন্মদিন, ভাল রান্নাবান্নার ব্যবস্থা, ও কি আর থাকে?' হেসে বলল কিশোর।

'পাগল ছেলে!' সস্নেহ হাসি ফুটল চাচীর মুখে। 'ও হ্যাঁ, মিরোকেও ধরে রাখিস। খেয়ে যাবে এখানেই।' বাড়ির দিকে রওনা হলেন তিনি।

মেরিচাচীর ডাক শুনে দরজায় বেরিয়ে এল এক কিশোর। লম্বায় রবিনের সমান হবে। পরনে নিখুঁত ছাঁটের নীল সুট, গলায় নীল টাই। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। খাটো করে ছাঁটা চুল।

এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিল মিরো। 'তুমি নিশ্চয় কিশোর-স্যান?' কথায় জাপানী টান স্পষ্ট। 'আর তুমি রবিন-স্যান? আমি মিরো, টোহা মুচামারুর ছেলে। আমার বাবা সুকিমিচি জুয়েলারস কোম্পানির সিকিউরিটি ইনচার্জ।'

'হ্যাল্লো, মিরো,' জোরে মিরোর হাত ঝাঁকিয়ে দিল কিশোর। 'গতকাল পরিচয় হয়েছে তোমার বাবার সঙ্গে।'

'জানি,' লজ্জিত হাসি হাসল মিরো। 'তোমাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেনি বাবা, এ-ও জানি। কিছু মনে কোরো না, বাবার তখন মাথা ঠিক ছিল না, কি বলতে কি বলে ফেলেছে। তার হয়ে তোমাদের কাছে মাফ চাইতে এসেছি।'

'আরে দূর, কি যে বল?' তাড়াতাড়ি বলল রবিন। 'যা অবস্থা ছিল তখন, মাথার ঠিক থাকে নাকি মানুষের? এতবড় দায়িত্ব, এত টাকার ব্যাপার। তাছাড়া আমাদের বয়েস কম, রত্নচোরের পেছনে লাগতে পারব বলে ভাবেননি আর কি। এখন বললেও অবশ্য কেসটা আর নিতে পারব না। অন্য একটা কাজ নিয়ে ফেলেছি, রত্নদানো ধরার কাজ।'

'রত্নদানো!' বড় বড় হয়ে গেল মিরোর চোখ। 'ওই যে বামন মানুষেরা, যারা সুড়ঙ্গে বাস করে, আর মাটির তলায় গুপ্তধন খুঁজে বেড়ায়? জাপানেও ওদের কথা জানে লোক। খবরদার, বেশি কাছাকাছি যেয়ো না! ভয়ঙ্কর জীব ওরা। বিপদে ফেলে দেবে।'

'বিপদে ফেলুক আর যা-ই করুক, আজ রাতে একটাকে ধরার চেষ্টা করব।' কিশোর বলল দাঁড়িয়ে কেন, চল বসি। চা খাবে?'

'খেয়েছি,' আবার অফিসে ঢুকল মিরো কিশোরের পিছু পিছু।

'আচ্ছা, আমাদের নাম জানলে কি করে?' বসতে বসতে বলল কিশোর। 'ঠিকানা পেলে কোথায়?'

পকেট থেকে একটা কার্ড বের করল মিরো। দলে মুচড়ে গিয়েছিল কার্ডটা, টেনেটুনে আবার ঠিক করা হয়েছে। 'মিউজিয়মে কুড়িয়ে পেয়েছি এটা। আর ঠিকানা? এ-শহরে তো তোমরা পরিচিত। প্রথম যে ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করলাম, সে-ই বলে দিল।'

'কপাল ভাল, শুঁটকির পাল্লায় পড়নি,' হেসে বলল রবিন।

'শুঁটকি?' মিরো অবাক।

'একটা ছেলে, আমাদের দেখতে পারে না,' প্রসঙ্গটা চাপা দিয়ে দিল কিশোর। 'হ্যাঁ, মিরো, গোল্ডেন বেল্ট খুঁজে পাওয়া গেছে?'

'না, কিশোর-স্যান,' হতাশভাবে মাথা নাড়ল মিরো। 'এত খুঁজল পুলিশ আর

আমাদের গার্ডরা, লাভ হল না। খুব মুষড়ে পড়েছে বাবা। তার নাকের ডগা দিয়ে বেল্ট চুরি করে নিয়ে গেল চোর, কিছুই করতে পারল না, এই দুঃখেই কাতর হয়ে পড়েছে। বেল্টটা না পাওয়া গেলে তার চাকরি থাকবে না, লজ্জা তো আছেই।'

কিছু একটা বলা দরকার, কিন্তু কথা খুঁজে পেল না রবিন।

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে হঠাৎ বলল, 'যা যা জেনেছ, সব খুলে বল তো মিরো!'

নতুন তেমন কিছুই জানার নেই, খবরের কাগজে প্রায় সবই জেনেছে কিশোর। আবার সে-সবই শুনল মিরোর মুখে। কোন পথে বের করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে গোল্ডেন বেল্ট, জানা যায়নি। রেইনবো জুয়েলস না নিয়ে কেন বেল্টটা নিল, এটাও একটা বড় রহস্য। পুরানো কথা সব।

'আমার ধারণা, গার্ডদের কেউই চুরি করেছে,' বলল রবিন।

'মনে হয় না,' মাথা নাড়ল মিরো। 'অনেক বেছে, দেখে শুনে তবে নেয়া হয়েছে গার্ড। প্রত্যেকেই বিশ্বাসী। তবু সবার সঙ্গে আলাদা আলাদা ভাবে কথা বলেছে বাবা। কাউকেই সন্দেহ হয়নি তার।'

'আচ্ছা, মিস্টার মার্চের খবর কি?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'তার সম্পর্কে কি জেনেছে পুলিশ?'

মিরো জানাল, পুলিশের দৃঢ় ধারণা ছিল, বেল্ট চুরির সঙ্গে মার্চও জড়িত। কিন্তু প্রমাণের অভাবে তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে তারা। প্রশ্ন, তাহলে মিউজিয়মে সেই অভিনয় কেন করল মার্চ? স্রেফ টাকার জন্যে। চুরির আগের দিন নাকি ফোনে এক মহিলা যোগাযোগ করেছে তার সঙ্গে (মহিলাকে চেনে না অভিনেতা, দেখেনি), বলেছে ছোট্ট একটা অভিনয়ের জন্যে পঞ্চাশ ডলার দেয়া হবে মার্চকে। লোভ দেখিয়েছে, এতে টাকা তো পাবেই অভিনেতা, তার নামও ছড়িয়ে পড়বে হলিউডে। পত্রিকায় ছবি ছাপা হবে তার, নাম ছাপা হবে। এরপর নাকি একটা ছবি করবে মহিলার স্বামী, ছবির নাম হবে 'দ্য গ্রেট মিউজিয়ম রবারি'। সেই ছবিতে অভিনয়ের সুযোগ দেয়া হবে মার্চকে। ব্যস, মজে গেল অভিনেতা। রাজি হয়ে গেল মিউজিয়মে ছোট্ট অভিনয়টুকু করতে। সেদিনই ডাকে তার কাছে এল ছোট্ট একটা প্যাকেট, তাতে একটা নকল পাথর, আর একটা খামে পঞ্চাশ ডলার।

'যা ভেবেছি,' বলল কিশোর। 'বেল্ট চুরির সঙ্গে জড়িত নয় টোড মার্চ। কি করে কোন পথে বেল্টটা নিয়ে যাওয়া হয়েছে, এখনও বুঝতে পারছে না পুলিশ, না?'

'না, পারছে না।'

'যদি বলি, বেল্টটা এখনও মিউজিয়মেই রয়েছে,' বোম ফাটাল যেন কিশোর।

'মিউজিয়মে!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন।

'কিন্তু মিউজিয়মের তো কোথাও খোঁজা বাদ নেই!' প্রতিবাদ করল মিরো। 'বেল্ট লুকানর আর জায়গা কোথায়, কিশোর স্যান?'

'আজ আরেকটা কেস নিয়ে কাজ করতে করতে হঠাৎ বুঝে গেলাম কোথায় আছে গোল্ডেন বেল্ট। আমার ধারণা...' নাটকীয় ভাবে চুপ করল কিশোর।

রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে রবিন আর মিরো।

'রবিন,' কিশোর বলল। 'মিস ভারনিয়ার বাড়িতে যে ছবিটা পড়ে গিয়েছিল...'

'হ্যাঁ। বল।'

'বড়সড় ভারি ছবি,' যেন রবিন দেখেনি, তাকে ছবিটা কেমন বোঝাচ্ছে কিশোর, 'ধরে তুললাম। প্রায় আড়াই ইঞ্চি মত মোটা ফ্রেম, ছবির পেছনে জায়গা রয়েছে অন্তত দুই ইঞ্চি। ওই রকম ফ্রেম কিংবা তার চেয়েও বড় অনেক ফ্রেমে বাঁধাই ছবি ঝোলানো রয়েছে মিউজিয়মে। তারমানে...'

'...তারমানে,' চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'ছবির পেছনের ওই খালি জায়গায় গোল্ডেন বেল্ট লুকিয়ে রাখা হয়েছে! অন্ধকারে বেল্টটা তুলে নিয়ে ওখানে ঢুকিয়ে দিয়েছে চোর!'

'চোরেরা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি,' বলল কিশোর। 'মিস্টার মার্চকে ফোন করেছিল যে মহিলা, চোরের সঙ্গে সে-ও নিশ্চয় জড়িত।'

আর শোনার অপেক্ষা করল না মিরো, লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। 'সারা মিউজিয়ম খুঁজেছে ওরা, কিন্তু ছবির পেছনে খুঁজে দেখার কথা মনে আসেনি কারও! এখুনি গিয়ে বাবাকে বলছি।'

'উত্তেজনা কমার অপেক্ষায় থাকবে চোর,' মিরোর কথা যেন শোনেইনি কিশোর। 'তল্পিতল্পা গুছিয়ে একদিন সুকিমিচি কোম্পানি চলে যাবে, তখন সময় বুঝে গিয়ে বেল্টা নিয়ে আসবে। ও হ্যাঁ, তোমার বাবাকে বল, ব্যালকনিতে ঝোলানো ছবিও যাতে বাদ না দেয়।'

'কিন্তু ব্যালকনিতে ওঠার পথ তো বন্ধ!'

'তাতে কি? একটা দড়ি হলেই উঠে যাওয়া যায় ওখানে। লুকানর সবচেয়ে ভাল জায়গা সারা মিউজিয়মে।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, কিশোর স্যান!' জ্বলজ্বল করছে মিরোর চোখ। 'তোমার অনুমান ঠিকই হবে! আমি যাই, বাবাকে গিয়ে বলি।'

'আরে দাঁড়াও দাঁড়াও,' হাত তুলল কিশোর। 'চাচী খেয়ে যেতে বলেছে।'

'আজ না, ভাই, আরেকদিন। আমি চলি,' আর দাঁড়াল না মিরো। প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল ইয়ার্ড থেকে।

কিশোরের দিকে চেয়ে হাসল রবিন। 'গোল্ডেন বেল্ট রহস্য ভেদ হয়ে গেল। আমাদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে তাড়িয়ে দিল তো, এখন লজ্জা পাবেন মিস্টার

মুচামারু।'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল কিশোর। 'আরও একটা ব্যাপার হতে পারে,' আপনমনেই বলল সে। 'কিন্তু···নাহ্, সেটা হওয়ার সম্ভাবনা কম। বেল্টটা বের করে নিয়ে যাওয়া হয়নি, তারমানে ভেতরেই আছে এখনও। তাহলে ছবির পেছনে ছাড়া লুকিয়ে রাখার আর জায়গা কোথায়?'

'আছে, ছবির পেছনেই,' বলল রবিন।

'কাল সকালেই জানা যাবে,' নিশ্চিত হতে পারছে না যেন কিশোর। 'এখন চল, খেয়ে নিই। তুমি খেয়ে বাড়ি চলে যাও, আমাকে কিছু জিনিসপত্র গোছাতে হবে। রত্নদানো ধরতে দরকার হবে। মুসা এলে তাকে নিয়ে মিস ভারনিয়ার বাড়িতে চলে যাব। কি হল না হল সকালে ফোনে জানাব তোমাকে। ফোনের কাছাকাছি থেক। আমি ফোন করলে পরে বোরিসকে নিয়ে আমাদের আনতে যেয়ো।'

'ঠিক আছে,' মাথা কাত করল রবিন। 'আচ্ছা, সত্যিই কি রত্নদানো আছে? নাকি ওসব মহিলার অতিকল্পনা? হয়ত ববের কথাই ঠিক, নিশিডাকে পায় তাঁকে।'

অসম্ভ নয়। ঘুমের ঘোরে অদ্ভুত সব কাণ্ড করে বসে মানুষ। এক ভদ্রলোকের কথা জানি, কয়েকটা মুক্তো নিয়ে খুব দুশ্চিন্তায় থাকত। খালি ভাবত, গেল বুঝি চুরি হয়ে। শেষে, এক রাতে উঠে সেফ থেকে মুক্তোগুলো বের করে লুকিয়ে রাখল আরেক জায়গায়, ঘুমের ঘোরে। সকালে উঠে সেফে ওগুলো না দেখে চেঁচামেচি শুরু করে দিল। রাতে নিজেই যে সরিয়েছে, কিছুতেই মনে করতে পারল না। আরেক রাতে ঘুমের ঘোরেই মুক্তোগুলো বের করে এনে সেফে আগের জায়গায় রেখে দিল আবার।' এক মুহূর্ত চুপ থেকে বলল, 'মিস ভারনিয়াও তেমন কিছু করে থাকতে পারেন। আজ রাতেই সেটা বুঝব। যদি সত্যিই,' রবিনের দিকে চেয়ে হাসল গোয়েন্দাপ্রধান, 'রত্নদানো আসে, তিন গোয়েন্দার ফাঁদে ধরা পড়তেই হবে তাকে।'

নয়

খুব ব্যস্ত রত্নদানোরা, গাঁইতি দিয়ে সমানে মাটি কুপিয়ে চলেছে, সুড়ঙ্গ খুঁড়ছে। সুড়ঙ্গের শেষ মাথায় রয়েছে খুদে মানুষগুলো, আবছা দেখতে পাচ্ছে রবিন। দ্রুত মনস্থির করে নিয়ে পা টিপে টিপে ওদের দিকে এগোল সে। কেবলই মনে হচ্ছে, ইস্, মুসা আর কিশোর যদি থাকত সঙ্গে! সুড়ঙ্গের বেশি গভীরে যেতে সাহস হচ্ছে না তার, কিন্তু এতখানি এসে ফিরেও যেতে চাইছে না।

বুকের ভেতরে জোরে জোরে লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ডটা, রবিনের ভয় হচ্ছে,

রত্নদানোদের কানে চলে যাবে ধুকপুক শব্দ। কিন্তু থামল না সে। হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে লাগল। রত্নদানোরা তার দিকে পেছন করে মাটি খোঁড়ায় ব্যস্ত।

শুকনো সুড়ঙ্গ, গাঁইতির ঘায়ে ধুলো উড়ছে, নাকে মুখে ঢুকে যাচ্ছে। হাঁচি পেল রবিনের। চেপেচুপে রাখার চেষ্টা করল, পারল না, 'হ্যাঁচচো' করে উঠল।

ধীরগতি ছায়াছবির মত যেন ধীরে ধীরে ঘুরল সবকটা রত্নদানো, কোপ মারার ভঙ্গিতে তুলে ধরেছে গাঁইতি।

ছোটার চেষ্টা করল রবিন। কিন্তু আঠা দিয়ে তার হাত-পা মাটিতে সেঁটে দেয়া হয়েছে যেন, এক চুল নড়াতে পারল না। চেঁচানর চেষ্টা করল, কিন্তু আওয়াজ বেরোল না গলা দিয়ে।

লাল টকটকে চোখ মেলে নীরবে চেয়ে আছে রত্নদানোরা। এই সময়ে রবিনের কানে এল একটা শব্দ। গায়ে মোলায়েম স্পর্শ। আবার ছুটে পালানর চেষ্টা করল সে, এবারেও ব্যর্থ হল।

কাঁধ চেপে ধরল শক্ত আঙুল, জোরে ঝাঁকুনি দিল। ডাক শোনা গেল, 'রবিন! এই রবিন! এমন করছিস কেন?'

ভোজবাজির মত অদৃশ্য হয়ে গেল রত্নদানোরা। মিলিয়ে গেল সুড়ঙ্গ। নড়েচড়ে উঠল রবিন, চেঁচাল, 'ছেড়ে দাও! আমাকে ছেড়ে দাও!'

'এই রবিন, ওঠ, চোখ মেল!'

আস্তে করে চোখ মেলল রবিন। পাশে দাঁড়িয়ে তার মা।

'দুঃস্বপ্ন দেখছিলি?' মা বললেন। 'ঘুমের মধ্যে এমন সব শব্দ করছিলি, যেন গলা টিপে ধরেছে কেউ। ওঠ, বারান্দায় খানিক হেঁটে আয়।'

'হ্যাঁ, মা, একটা খুব খারাপ স্বপ্ন দেখছিলাম। জাগিয়ে দিয়ে ভাল করেছ। মা, কিশোর ফোন করেছিল?'

'কিশোর? এত রাতে ও ফোন করতে যাবে কেন? যা, বারান্দা থেকে হেঁটে এসে শুয়ে পড়। রাতদুপুর এখন।'

'হাঁটতে হবে না।'

'তাহলে আবার তো দুঃস্বপ্ন দেখবি।'

'দেখব না,' পাশ ফিরে কোলবালিশটা টেনে নিল রবিন।

মুসা আর কিশোরের কথা ভাবল, ওরা এখন কি করছে?

লস অ্যাঞ্জেলেসের শহরতলীর দিকে ছুটে চলেছে ট্রাক। বোরিস চালাচ্ছে। পাশে বসেছে কিশোর আর মুসা।

রত্নদানো ধরার জন্যে কি কি যন্ত্রপাতি এনেছে, মুসাকে এক এক করে দেখাচ্ছে কিশোর। 'এই যে ক্যামেরা, স্পেশাল ক্যামেরা, দশ সেকেণ্ডেই ছবি তৈরি হয়ে যায়। ভাঙা অবস্থায় কিনেছিলাম একটা ছেলের কাছ থেকে, টুকটাক যন্ত্র

লাগিয়ে সারিয়ে নিয়েছি। চমৎকার কাজ দেয় এখন। এই যে, ফ্ল্যাশগানও রয়েছে। রত্নদানো এলেই টুক করে ছবি তুলে নেব আগে।' ক্যামেরাটা রেখে ব্যাগ থেকে দু'জোড়া দস্তানা বের করল। ওগুলোর তালুর কাছে চামড়া লাগানো। 'দানো ব্যাটাদের আঁকড়ে ধরার জন্যে, পিছলে ছুটে যেতে পারবে না। ব্যাটাদের হাতে লম্বা চোখা নখ থাকার কথা, খামছি দিলেও এই দস্তানার জন্যে লাগাতে পারবে না।'

'সেরেছে!' চোখ বড় বড় হয়ে গেছে মুসার। 'রত্নদানো আসবে, ধরেই নিয়েছে মনে হচ্ছে?'

'আগে থেকেই তৈরি থাকা ভাল। টর্চ এনেছি, আর এই যে দড়ি, নাইলনের, ভীষণ শক্ত। দানো ব্যাটাদের ধরে বাঁধলে ছিঁড়তে পারবে না।'

দড়ি আর দস্তানা রেখে একটা ওয়াকি-টকি বের করল কিশোর। রেঞ্জ কম যন্ত্রটার, কিন্তু দরকারের সময় খুব কাজে লাগে। যোগাযোগ রাখায় খুব সুবিধে। ওটা রেখে টেপরেকর্ডার বের করে দেখাল মুসাকে। রত্নদানোরা কোন রকম শব্দ করলে, সেটা রেকর্ড করবে।

যন্ত্রপাতির ব্যাগটার দিকে চেয়ে আপনমনেই মাথা নাড়ল কিশোর। 'সবই এনেছি। আর কিছু বাকি নেই। ও হ্যাঁ, মুসা, চক এনেছ?'

পকেট থেকে নীল চক বের করে দেখাল মুসা। কিশোর এনেছে সাদা চক।

'না, আর কিছু বাকি নেই,' খুশি হয়ে বলল কিশোর। 'টুথব্রাশ এনেছ?'

পাশে রাখা ছোট হ্যাণ্ডব্যাগটা দেখাল মুসা। 'পাজামাও এনেছি। রাতে থাকব, ওসব তো দরকার।'

'পাজামা লাগবে না। রাতে তো আর ঘুমাচ্ছি না। কাপড়চোপড় সব পরে বসে থাকব, রত্নদানো এলেই যেন ছুটে গিয়ে খপ করে ধরতে পারি।'

আর চুপ থাকতে পারল না বোরিস। 'দানো ধরার জন্যে তৈরিই হয়ে এসেছে একেবারে! সাবধান, খুব খারাপ জীব ওরা। বিকেলে রোভারের সঙ্গেও আলাপ করেছি, ও আমার সঙ্গে একমত। রত্নদানোরা খারাপ, বিশেষ করে ব্ল্যাক ফরেস্টের গুলোতে একেকটা সাক্ষাৎ ইবলিস। ওদের চোখের দিকে সরাসরি তাকিও না, পাথর হয়ে যাবে!'

এতই আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কথাগুলো বলল বোরিস, অস্বস্তি বোধ করতে লাগল মুসা। রত্নদানো বাস্তবে নেই, এতক্ষণ যে ধারণাটা ছিল, সেটা বদলে গেল মুহূর্তে। বোরিস বলছে, রত্নদানো আছে, রোভারও বিশ্বাস করে, মিস ভারনিয়া নাকি দেখেছেন, এমনকি রবিনও দেখেছে। এতগুলো লোক···

কিশোরের কথায় মুসার ভাবনায় ছেদ পড়ল। 'কিন্তু বোরিস, মিস ভারনিয়াকে সাহায্য করব কথা দিয়ে ফেলেছি আমরা। এখনও জানি না, সত্যি রত্নদানোরাই বিরক্ত করছে তাঁকে, নাকি অন্য কিছু। তাছাড়া, কি ধরনের রহস্য নিয়ে কাজ

না

করতে পছন্দ করে তিন গোয়েন্দা...'

'যে কোন ধরনের উদ্ভট রহস্য...' বলতে বলতে থেমে গেল মুসা। এই রত্নদানোর ব্যাপারটা উদ্ভটের চেয়েও উদ্ভট হয়ে যাচ্ছে না তো?

দশ

মিস ভারনিয়ার আঙিনা অন্ধকার। নির্জন ব্যাংক আর পোড়ো থিয়েটার বাড়িটাকে যেন গিলে ফেলেছে গাঢ় অন্ধকার। সরু বাড়ির একটা ঘরে আলো জ্বলছে, তার মানে অপেক্ষা করছেন লেখিকা, জেগে আছেন গোয়েন্দাদের অপেক্ষায়।

ট্রাক থেকে নেমে এল কিশোর আর মুসা।

জানালার বাইরে মুখ বের করল উদ্বিগ্ন বোরিস। 'কিশোর, আবার বলছি, রত্নদানো ধরার চেষ্টা কোরো না। ব্ল্যাক ফরেস্টে অনেক পুরানো গুঁড়ি আর পাথর দেখেছি, এক সময় ওরা জ্যান্ত মানুষ ছিল। রত্নদানোরা ওদের ওই অবস্থা করেছে। খবরদার, ওদের চোখে চোখে চেও না কিছুতেই!'

গাঢ় বিশ্বাস বোরিসের। মুসার ভাল লাগছে না ব্যাপারটা। অস্বস্তি বোধ বাড়ছে। অবচেতন মন হুঁশিয়ার করে দিল, সামনে রাতটা ভাল যাবে না।

বোরিসকে বিদায় জানাল কিশোর। কথা দিল, হুঁশিয়ার থাকবে, যাতে তাকে পাথর না বানাতে পারে রত্নদানোরা। বলল, সকালে রবিনের কাছে ফোন করবে, তখন যেন তাকে সহ ট্রাক নিয়ে চলে আসে।

বেড়ার ধার ঘেঁষে গেটের দিকে এগোল দুই গোয়েন্দা। আড়াল থেকে কেউ তাদের ওপর চোখ রাখছে না তো? কি জানি! এত অন্ধকার, প্রায় কিছুই দেখা যায় না।

হাতড়ে হাতড়ে গেটের পাশে লাগানো বেলপুশটা বের করে একবার টিপল কিশোর। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গুঞ্জন উঠল গেটের মেকানিজমে। খুলে গেল পাল্লা, দুই গোয়েন্দা আঙিনায় ঢুকে পড়তেই আবার বন্ধ হয়ে গেল।

থমকে দাঁড়িয়ে কান পাতল কিশোর। অবাক লাগছে মুসার, এত সাবধানতা কেন? বিপদ সত্যি আশা করছে গোয়েন্দাপ্রধান? নাকি অযথাই অতিরিক্ত নাটকীয় করে তুলছে পরিস্থিতিকে। কিন্তু তেমন স্বভাব তো নয় কিশোরের? ভয় পেল মুসা।

অন্ধকার আঙিনা। নিঃশব্দে কিশোরের পেছনে এগোল মুসা। সিঁড়ি ভেঙে বারান্দায় উঠল। দরজার পাল্লা ভেজানো, ঠেলা দিতেই খুলে গেল, ভেতরে ঢুকে পড়ল দু'জন।

শুকনো, ফ্যাকাসে মুখে দুই গোয়েন্দাকে স্বাগত জানালেন মিস ভারনিয়া। হাঁপ ছেড়ে বললেন, 'তোমরা এসে পড়েছ, ভাল হয়েছে। জীবনে এই পথম এত

নার্ভাস ফীল করছি। যা ঘটেছে, এর চেয়ে বেশি কিছু ঘটলে আর থাকব না এ-বাড়িতে এবার ঠিক পালাব। রবার্টের কাছে বাড়ি বেচে দিয়ে দূরে কোথাও চলে যাব।'

'এত ভেঙে পড়ার কিছু নেই, মিস ভারনিয়া,' কোমল গলায় বলল কিশোর। 'আমরা তো আছি।'

কেমন এক ধরনের কাঁপা হাসি ফুটল লেখিকার ঠোঁটে। 'রাত বেশি হয়নি। মাঝরাতের আগে ওরা আসে না। এতক্ষণ কি করবে? বসে বসে টেলিভিশন দেখ।'

'বরং একটু ঘুমিয়ে নিই,' বলল কিশোর। 'এই সাড়ে এগারোটা নাগাদ উঠে পড়ব। তাজা শরীর নিয়ে খুব আরামে পাহারা দিতে পারব বাকি রাতটা।'

'আরাম! আশ্চর্য!' বিড়বিড় করল মুসা।

সহকারীর কথায় কান না দিয়ে বলল কিশোর, 'টেবিল ঘড়ি আছে আপনার? অ্যালার্ম ক্লক?'

'আছে।'

সিঁড়ির মাথায় ছোট ঘরটা দুই গোয়েন্দাকে দেখিয়ে দিলেন মিস ভারনিয়া। দুটো বিছানা করে রেখেছেন। টেবিলে ব্যাগ রেখে শুধু জুতো খুলে সটান বিছানায় শুয়ে পড়ল কিশোর।

মুসাও শু'লো। খানিকক্ষণ গড়াগড়ি করে এক সময় সে-ও ঘুমিয়ে পড়ল। তার মনে হল, চোখ বোজার সঙ্গে সঙ্গেই বেজে উঠেছে হতচ্ছাড়া ঘড়ির বেল।

'ক'টা বাজল?' চোখ না খুলেই বিড়বিড় করল মুসা।

'সাড়ে এগারো,' চাপা গলায় বলল কিশোর। 'মিস ভারনিয়া শুয়ে পড়েছেন বোধহয়। তুমি আরও খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে নিতে পার। আমি পাহারায় থাকছি।'

'পাহারা!' বিড়বিড় করল আবার মুসা, কয়েক সেকেণ্ডেই ঘুমিয়ে পড়ল।

রবিনের মতই দুঃস্বপ্ন দেখতে শুরু করল মুসা। স্বপ্নের মাঝেই কানে এল জানালায় টোকার শব্দ।

ঘুম ভেঙে গেল মুসার, পলকে পুরো সজাগ। টোকার শব্দ হচ্ছে এখনও। তালে তালে একটা বিশেষ ছন্দেঃ এক···তিন···দুই···তিন···এক। কোন রকম সঙ্কেত? নাকি জাদু করছে রক্তদানোরা···

বিছানায় সোজা হয়ে বসল মুসা। চোখ জানালার দিকে। গতি বেড়ে গেছে হৃদযন্ত্রের, গলার কাছে ঠেলে উঠতে চাইছে কি যেন।

জানালায় উঁকি দিল একটা মুখ!

খুদে একটা মুখ, লাল চোখ, রোমশ কান, সারকাসের ক্লাউনের মত চোখা লম্বা নাক। ছোট ছোট ঠোঁট সরে গিয়ে বেরিয়ে পড়েছে চোখা শ্বদন্ত, ভেঙচি কাটছে যেন।

হঠাৎ ঘরে যেন বিদ্যুৎ চমকে উঠল, লাফিয়ে খাট থেকে নামল মুসা। চোখের পলকে নেই হয়ে গেল মুখটা।

'তুলেছি!' অন্ধকার কোণ থেকে চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। 'মুসা, তুলে ফেলেছি!'

'ওই ব্যাটা রত্নদানো, কোন সন্দেহ নেই!' মুসাও চেঁচিয়ে বলল।

'ছবি তুলে ফেলেছি। এখন ধরতে হবে ব্যাটাকে!'

জানালার কাছে এসে দাঁড়াল দু'জনে। চোখ মিটমিট করে তাকাল নিচে আঙিনার দিকে। কৃষ্ণপক্ষের একফালি চাঁদের ঘোলাটে আলোয় দেখা গেল, চারটে খুদে মূর্তি পাগলের মত নাচানাচি করছে। নাচছে কুদছে, এ-ওর ঘাড়ে পড়ছে, ডিগবাজি খাচ্ছে। উল্লাসে ফেটে পড়ছে, যেন সারকাসের কয়েকটা ক্লাউন।

ফ্ল্যাশগানের আলো চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল, ধীরে ধীরে আবার আবছা অন্ধকার সয়ে এল দুই গোয়েন্দার চোখে। মূর্তিগুলোকে আরও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে এখন। দানোদের মুখের সাদা রঙও দেখতে পাচ্ছে। পরনে চামড়ার পোশাক, পায়ে চোখা জুতো।

'কিশোর,' ফিসফিস করে বলল মুসা। 'আঙিনায় খেলা জুড়েছে কেন ব্যাটারা?'

'খুব সহজ কারণ,' জুতোর ফিতে বাঁধছে গোয়েন্দাপ্রধান। 'আমাদেরকে ভয় দেখিয়ে তাড়াতে চায়।'

'ভয়? তা দেখাতে পেরেছে, অন্তত আমাকে তো বটেই। কিন্তু কেন? সুড়ঙ্গ খোঁড়া বাদ দিয়ে মানুষের পেছনে লেগেছে কেন?'

'ওদের ভাড়া করে আনা হয়েছে। কাজটা বোধহয় মিস ভারনিয়ার ভাইপোর।'

'বব! জুতোর ফিতে বাঁধতে বাঁধতে হাত থেমে গেল মুসার। 'কেন?'

'ভয় পেয়ে যাতে বাড়িটা বিক্রি করে দেন মিস ভারনিয়া। পটিয়েপাটিয়ে ফুফুর কাছ থেকে তখন প্রচুর নগদ টাকা আদায় করে নিতে পারবে বব।'

'ঠিক, ঠিক বলেছ কিশোর। এখন বুঝতে পারছি সব ববের শয়তানি!'

'এবং সেটা প্রমাণ করা দরকার। অন্তত একটা দানোকে ধরতেই হবে।'

ব্যাগ থেকে দড়ির বাণ্ডিল বের করে কোমরে ঝোলাল কিশোর। একজোড়া দস্তানা মুসাকে দিয়ে আরেক জোড়া নিজে পরল। ক্যামেরা ঝুলিয়ে নিল কাঁধে। যার যার কোমরের বেল্টে ঝুলিয়ে টর্চ নিল দুটো, হাত মুক্ত রাখল।

'কিন্তু জানালায় উঁকি দিল কি করে রত্নদানো?' প্রশ্ন করল মুসা। 'দোতলার জানালা...'

'ভালমত ভাব, বুঝে যাবে। এখন চল যাই। মিস ভারনিয়া হয়ত ঘুমিয়ে

আছেন, তাঁকে ডাকার দরকার নেই। চেঁচামেচি শুরু করলে দানোরা পালাবে।'

নিচতলার বারান্দায় বেরিয়ে এল দু'জনে। ছায়ার মত নিঃশব্দে চলে এল বাড়ির এক কোণে। দেয়ালের সঙ্গে প্রায় লেপটে থেকে মুখ বাড়িয়ে উঁকি দিল।

উঠনে এখনও লাফালাফি করছে চার দানো।

'ধর,' মুসার হাতে দড়ির এক প্রান্ত গুঁজে দিল কিশোর। আরেক মাথা নিজের কব্জিতে পেঁচিয়ে বাঁধল। 'দড়ি টান টান করে ধরে দৌড় দেবে, যার গায়েই দড়ি বাঁধুক পেঁচিয়ে ফেলবে সঙ্গে সঙ্গে। দাও দৌড়!'

এক সঙ্গে দৌড় দিল দু'জনে। একটা ঝোপের ধার দিয়ে যাওয়ার সময় ডালে আটকে গেল হঠাৎ কিশোরের কাঁধে ঝোলানো ক্যামেরার বেল্ট, খাপসহ ছিঁড়ে পড়ে গেল ক্যামেরা, কিন্তু থামল না সে।

ছেলেদেরকে আসতে দেখল রক্তদানোরা। তীক্ষ্ণ শিস দিয়ে উঠে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দৌড় দিল দেয়ালের ছায়ার দিকে।

'থেম না, মুসা!' চেঁচিয়ে বলল কিশোর। 'একটাকে অন্তত ধরা চাই!'

একটা খুদে মূর্তির কাঁধ খামচে ধরল মুসা, কিন্তু ধরে রাখতে পারল না, ঝট করে বসে পড়েছে দানোটা। তাল সামলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল সে। কিশোরও ছুটে এসে হোঁচট খেয়ে পড়ল মুসার গায়ের ওপর। তাড়াহুড়ো করে উঠে দাঁড়াল আবার দু'জনেই। চকিতের জন্যে দেখল, থিয়েটার বাড়ির দিকে ছুটে পালাচ্ছে দানোগুলো।

'গেট!' হাঁপাচ্ছে কিশোর। 'খোলা!'

'বাড়িতে ঢুকে পড়েছে!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'কিশোর, জলদি এস!'

'মুসা, দাঁড়াও!' ডাকল কিশোর। 'একটা ব্যাপার...' আর কিছু বলার আগেই হাতের দড়িতে হ্যাঁচকা টান পড়ল, বাধ্য হয়েই তাকেও মুসার পিছু নিতে হল।

থিয়েটারে আগুন লাগলে কিংবা অন্য কোনরকম জরুরি অবস্থার সৃষ্টি হলে, বেরোনর জন্যে একটা ইমার্জেন্সী ডোর রাখা হয়েছিল, সেটা এখন খোলা। সেদিক দিয়েই ভেতরে ঢুকেছে দানোরা। মুসাও ঢুকে পড়ল সেই দরজা দিয়ে।

মুসার সঙ্গে তাল রাখতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে কিশোর। গতি কমাতেও পারছে না, তাহলে টানের চোটে হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পরতে হবে। মুসার পেছনে বাড়ির ভেতরের গাঢ় অন্ধকারে ঢুকে পড়ল সে-ও। পেছনে দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। আটকা পড়ল দুই গোয়েন্দা।

মুহূর্ত পরেই চারপাশ থেকে আক্রান্ত হল ওরা। চোখা তীক্ষ্ণ অনেকগুলো নখ খামচে ধরল ওদেরকে।

এগারো

'বাঁচাও! বাঁচাও!' চেঁচাতে লাগল মুসা। 'দানোরা মেরে ফেলল আমাকে!'

'আমাকেও ধরেছে!' গুঙিয়ে উঠল কিশোর। দু'হাতে মেরে গায়ের ওপর থেকে সরানর চেষ্টা করল খুদে মানুষগুলোকে। 'আমাকে আটকে ফেলেছে!'

এখনও দড়ি ধরে রেখেছে মুসা, কি ভেবে হ্যাঁচকা টান মারল কিশোর। চেঁচিয়ে উঠল এক দানো, দড়িটা প্রচণ্ড জোরে বাড়ি মেরেছে তার গলায়।

চমকে গেল দানোরা।

ক্ষণিকের জন্যে গায়ে চাপ কমে গেল, সুযোগটার সদ্ব্যবহার করল কিশোর। ঝাড়া মেরে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে চলে এল মুসার কাছাকাছি। হাতে একটা চামড়ার জ্যাকেট ঠেকতেই খামচে ধরে হ্যাঁচকা টান মারল, একটানে দানোটাকে সরিয়ে আনল মুসার গায়ের ওপর থেকে, প্রায় ছুঁড়ে ফেলে দিল একপাশে। মেঝেতে পড়ে তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠল দানোটা।

আরেকটা দানোকে ধরে মাথার ওপরে তুলে ছুঁড়ে ফেলল মুসা।

গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়াল দুই গোয়েন্দা, দু'জনেই মুক্ত এখন। হাঁপাচ্ছে জোরে জোরে। কব্জি থেকে দড়ি খুলে নিয়ে গুটিয়ে আবার কোমরে ঝোলাল কিশোর।

'এখন কি করা, কিশোর?' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল মুসা।

'দরজা খুঁজে বের করতে হবে। আমাদের পেছনেই বোধহয় ওটা, এই যে এদিকে,' মুসার হাত ধরে টানল কিশোর।

কয়েক পা এগোতেই দেয়াল ঠেকল হাতে। হাতড়াতে শুরু করল কিশোর। দরজার হাতলে আঙুল ঠেকতেই চেপে ধরে টান দিল। খুলল না দরজা, তালা আটকানো।

'আটকা-ই পড়লাম,' বিষণ্ণ শোনাল কিশোরের গলা। 'ওভাবে এসে ঢুকে পড়াটা উচিত হয়নি মুসা। উল্টে আমরাই ওদের ফাঁদে ধরা পড়লাম।'

'হ্যাঁ, কাজটা ঠিক হয়নি! তোমাকেও টেনে আনলাম এর মাঝে!'

'এটাই চাইছিল ওরা। যা হওয়ার হয়ে গেছে···ওই যে, শুনতে পাচ্ছ?'

না শোনার কোন কারণ নেই, তীক্ষ্ণ শিস দিচ্ছে দানোরা। ডানেবাঁয়ে দু'দিকে।

'আবার আক্রমণের জন্যে তৈরি হচ্ছে!' চাপা গলায় বলল মুসা।

'জলদি বেরোতে হবে এখান থেকে! আরও পথ থাকতে পারে।'

'থাকলেও অন্ধকারে খুঁজে বের করব কিভাবে?'

'আরে তাই তো, টর্চ! ভুলেই গিয়েছিলাম! ভয় এভাবেই আচ্ছন্ন করে মনকে···আছে, কোমরেই আছে।'

মুসার টর্চও ঝোলানো আছে কোমরের বেল্টে। খুলে নিয়ে সুইচ টিপতেই অন্ধকার চিরে দিল তীব্র আলোকরশ্মি। আধ সেকেণ্ড পর কিশোরের টর্চও জ্বলে উঠল।

গায়ে আলো পড়তেই ছুটোছুটি করে লুকিয়ে পড়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল খুদে মানুষগুলো। অদ্ভুত ভাষায় চিঁচিঁ করে কি সব বলছে। অনেক বেশি সতর্ক এখন রক্তদানোরা। বুঝে গেছে, সহজে ছেলেদুটোকে কাবু করা যাবে না।

থিয়েটার মঞ্চের পেছনে রয়েছে দুই গোয়েন্দা। আয়তাকার কাঠের ফ্রেমে আটকানো ক্যানভাসের বড় বড় অসংখ্য 'ফ্ল্যাট' একটার ওপর আরেকটা সাজিয়ে সারি দিয়ে রাখা হয়েছে। নানারকম ছবি, সিনসিনারি আঁকা ওসব ফ্ল্যাটে। নাটক অভিনয়ের সময় দৃশ্যপট পরিবর্তনের কাজে ব্যবহার হত ওগুলো। মই আর অন্যান্য কাজের জিনিস এখন পড়ে আছে অবহেলিত হয়ে, পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে অনেক বছর ধরে।

বাতাসে ডানা ঝাপটানর শব্দ, মাথার ওপর দিয়ে শব্দ করে উড়ে গেল একটা বাদুড়।

'বাদুড়! চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

'বাদুড়ে কামড়ায় না। চেঁচিও না অযথা। ওই যে, দেখ, দানোরা আসছে!' চ্যালাকাঠকে লাঠির মত বাগিয়ে ধরে পায়ে পায়ে এগোচ্ছে খুদে মানুষেরা, সেদিকে দেখাল কিশোর। 'এখন যাই কোথায়?'

'এদিকে! ছোট!' বলেই দুই সারি ফ্ল্যাটের মধ্যে দিয়ে ছুটল মুসা।

কিশোরও ছুটল মুসার পেছনে। হঠাৎ থেমে মইটাকে এক টান মেরে ফেলে দিয়ে আবার ছুটল। তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচিয়ে উঠল এক দানো, বোধহয় গায়ের ওপর মই পড়েছে, কিংবা হোঁচট খেয়ে মাটিতে পড়ে গেছে ওটা। সেসব দেখার সময় নেই এখন দুই গোয়েন্দার, ছুটছে প্রাণপণে।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল মুসা। 'সামনেও আছে দুটো। দু'দিক থেকে আক্রমণের তালে আছে!'

দ্রুত এপাশ-ওপাশ দেখে নিল কিশোর। সারি দিয়ে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে অনেকগুলো ফ্ল্যাট। আঙুল তুলে দেখাল সে, 'ওগুলোর ভেতর দিয়ে যাব!'

জোরে লাথি মারল কিশোর। ফড়াৎ করে ছিঁড়ে গেল পুরানো ক্যানভাস। মুসাকে নিয়ে ওটার ভেতরে ঢুকে পড়ল সে।

একের পর এক দৃশ্যপট ছিঁড়ে আরও ভেতরে ঢুকে চলল দুই গোয়েন্দা। পেছনে দুলছে ছেঁড়া ক্যানভাস। ওপাশে রয়েছে রক্তদানোরা, ওদেরকে দেখা যাচ্ছে না এখন, তবে চেঁচামেচি কানে আসছে।

কাঠের তৈরি বিশাল মঞ্চের কাছে চলে এল দু'জনে। লাফিয়ে উঠে পড়ল

তাতে। সামনে আলো ফেলল। পুরানো, ধুলোমাখা নোংরা সিটের সমুদ্র চোখে পড়ল। ওগুলোর পেছনে নিশ্চয় দরজা রয়েছে। থাকলেও খোলা না বন্ধ কে জানে!

পেছনে হালকা পায়ের শব্দ ছুটে আসছে। ঘুরে আলো ফেলল মুসা। পৌঁছে গেছে দানোরা।

'দৌড়াও!' চেঁচিয়ে বলল মুসা। 'দুই সারির মাঝখানের পথ ধরে ঢুকে পড়ব!'

মঞ্চের এক পাশের কাঠের সিঁড়ি বেয়ে হলের মেঝেতে নেমে পড়ল ওরা। ঠিক এই সময় জ্বলে উঠল হলের আলো, মেইন সুইচ অন করে দিয়েছে কেউ।

পেছনে তাকাল একবার কিশোর। হাতে চ্যালাকাঠ নিয়ে ছুটে আসছে দুটো খুদে মানুষ। ঝাড়বাতির রঙিন আলোয় অদ্ভুত দেখাচ্ছে দানোদুটোকে।

ছুটতে ছুটতে হাত বাড়িয়ে হঠাৎ ছাত থেকে ঝুলন্ত একটা দড়ি ধরে ফেলল এক দানো। জোরে এক দোল দিল দড়াবাজিকরের মত, চোখের পলকে উড়ে এসে পড়ল কিশোরের ঘাড়ে।

হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল কিশোর, হাত থেকে ছুটে গেল টর্চ। খোঁজার সময় নেই, গায়ে চেপে বসেছে দানো, ওটাকে ছাড়াতেই ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে।

টর্চটা একটা সিটের ওপর রেখে এগিয়ে এল মুসা। দানোর কোমড় আঁকড়ে ধরে হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে নিল কিশোরের ওপর থেকে, গুঁজে দিল দুটো সিটের মাঝখানের ফাঁকে। অসহায় ভঙ্গিতে ঝুলে থেকে হাত-পা ছুঁড়তে শুরু করল দানো, সাহায্যের জন্যে চেঁচাতে লাগল।

সঙ্গীকে সাহায্য করতে ছুটে এল দ্বিতীয় দানোটা। এই সুযোগে ছুটে গিয়ে একটা পথে ঢুকে পড়ল দুই গোয়েন্দা। ছুটল লবির দিকে।

বাইরে বেরোনর দরজার গায়ে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল দু'জনে, ধাক্কা দিল। কিন্তু এক চুল নড়ল না বিশাল ভারি দরজা।

'বাইরে থেকে তক্তা লাগিয়ে পেরেক মেরে রেখেছে!' দমে গেল মুসা। জোরে জোরে হাঁপাচ্ছে। 'জানালা খুঁজে বের করতে হবে। কিশোর, এস।'

টর্চ হাতে এক পাশের করিডর ধরে ছুটল মুসা। এক সারি সিঁড়ির গোড়ায় এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। এক মুহূর্ত দ্বিধা করেই পা রাখল সিঁড়িতে।

একেকবারে দু'তিনটে করে সিঁড়ি টপকাতে লাগল দু'জনে। ঘুরে ঘুরে উঠে গেছে পুরানো ধাঁচের সিঁড়ি, শেষ নেই যেন এর। কয়টা মোড় ঘুরল ওরা, বলতে পারবে না।

সিঁড়ি শেষ হল। ব্যালকনিতে উঠে এল ওরা। জিরিয়ে নেয়ার জন্যে থামল। একধারে ঘোরানো রেলিঙ, রঙিন মখমলে ঢাকা। টর্চ নিভিয়ে সেদিকে এগোল মুসা।

রেলিঙের ওপর দিয়ে সাবধানে উঁকি দিল দুই গোয়েন্দা। অনেক নিচে হলের মেঝেতে চারটে খুদে মূর্তি এক জায়গায় জড়ো হয়ে উত্তেজিত ভাবে কথা বলছে।

এক সময় আরেকটা মূর্তি এসে যোগ দিল ওদের সঙ্গে। বলিষ্ঠ দেহী স্বাভাবিক একজন মানুষ।

'বার্ট!' আঁতকে উঠল মুসা, চাপা কণ্ঠস্বর। 'দানোদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে বার্ট!'

'তাইতো দেখছি!' ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেছে কিশোর। 'মস্ত একটা ভুল করেছি আমি, মুসা।...ওই যে, শোন।'

'দাঁড়িয়ে আছ কেন, চামচিকের দল!' নিচে ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছে বার্ট। 'খোঁজ, খোঁজ! বিচ্ছুদুটোকে ধরতেই হবে! সব দরজা আটকানো, পালাতে পারবে না ওরা।'

ছড়িয়ে পড়ল চারটে খুদে মানুষ।

'আমরা কোথায়, বুঝতে পারছে না ব্যাটারা,' ফিসফিস করে বলল কিশোর। 'কোথাও লুকিয়ে থাকতে হবে আমাদের এখন। মিস ভারনিয়া জেগে উঠলেই আমাদের খোঁজ পড়বে...'

'ইয়াল্লা! ভুলেই গিয়েছিলাম! তাই তো, আমাদের না দেখলে পুলিশকে খবর পাঠাবেন তিনি! এ-বাড়িতে নিশ্চয় খুঁজবে পুলিশ,' আশায় দুলে উঠল মুসার বুক।

'ঝোপের ধারে আমার ক্যামেরাটা খুঁজে পাবে পুলিশ,' কিশোর বলল। 'ফিল্ম বের করে দেখলেই বুঝে যাবে, অদ্ভুত কিছু একটা ঘটছে এই এলাকায়।'

'চল, কোথাও লুকিয়ে পড়ি,' অধৈর্য কণ্ঠে বলল মুসা। 'শুনতে পাচ্ছ না, সিঁড়িতে শব্দ?'

বারো

পরিচিত একটা শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গেল মিস ভারনিয়ার। গাঁইতি দিয়ে মাটি কোপাচ্ছে কেউ! চুপচাপ বিছানায় পড়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। হ্যাঁ, সেই শব্দ! তাঁর ঘরের ভিতের নিচে যেন মাটি কাটছে রত্নদানোরা!

ছেলেরা কি শুনতে পাচ্ছে? ওরা থাকায় ভালই হয়েছে, ভাবলেন মিস ভারনিয়া। কিন্তু কোনরকম সাড়াশব্দ নেই কেন ওদের? এখনও ঘুমিয়ে আছে।

'কিশোর! মুসা!' গলা চড়িয়ে ডাকলেন লেখিকা।

সাড়া এল না। উঠে গিয়ে ডেকে ওদের জাগাতে হবে, ভাবলেন মিস ভারনিয়া। বিছানা থেকে নেমে পায়ে স্লিপার গলালেন। একটা আলোয়ান গায়ে চড়িয়ে বেরোলেন ঘর থেকে। ছেলেদের ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালেন।

'কিশোর! মুসা!' আবার ডাকলেন মিস ভারনিয়া।

কোন সাড়া নেই। অবাক কাণ্ড! দরজা খুলে সুইচ টিপে আলো জ্বেলে নিলেন তিনি। বিছানার দিকে চোখ পড়তেই দম আটকে গেল যেন। শূন্য বিছানা!

দুরুদুরু করতে লাগল বুকের ভেতর, সারা ঘরে চোখ বোলালেন মিস ভারনিয়া। চেয়ারের হেলানে রাখা আছে মুসার পায়জামা, ভাঁজও খোলা হয়নি। টেবিলে পড়ে আছে ছেলেদের ব্যাগ, অথচ ওরা নেই। এর মানে? পালায়নি তো! নিশ্চয় মাটি কাটার শব্দ শুনেছে, দানোদের দেখেছে, ব্যস ভয় পেয়ে পালিয়ে গেছে মুসা আর কিশোর।

'ঈশ্বর!' আপনমনেই বিড়বিড় করলেন লেখিকা, 'এখন আমি কি করি!'

আর থাকা যায় না এ-বাড়িতে, ভাবলেন মিস ভারনিয়া। মুসা আর কিশোরের মত ছেলেও যখন ভয় পেয়ে পালিয়েছে, তিনি আর থাকেন কোন ভরসায়? নাহ, আর থাকবেন না, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন লেখিকা।

আপাতত ববের ওখানে গিয়েই উঠবেন, ভেবে, তাকে টেলিফোন করার জন্যে নিচে নামলেন মিস ভারনিয়া। হাত কাঁপছে, ডায়াল করতে পারছেন না ঠিকমত। সঠিক নাম্বার পাওয়ার জন্যে তিনবার চেষ্টা করতে হল তাঁকে। অবশেষে রিসিভারে ভেসে এল ববের ঘুমজড়িত কণ্ঠ।

'বব!' ভয়ে ভয়ে এদিক-ওদিক তাকালেন মিস ভারনিয়া। 'রত্নদানো! আবার এসেছে! স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি মাটি কোপানর শব্দ! বব, আর এক মুহূর্তও এখানে না! তোমার ওখানে চলে আসছি এখুনি। কাল···হ্যাঁ, কালই বাড়ি বিক্রি করে দেব।'

'বাড়ি বিক্রির কথা পরে হবে ফুফু,' ঘুমের লেশমাত্র নেই আর ববের কণ্ঠে। 'জলদি তৈরি হয়ে নাও। আমি আসছি, এই বড় জোর দশ মিনিট।'

'পাঁচ মিনিটেই হয়ে যাবে আমার,' রিসিভার নামিয়ে রাখলেন মিস ভারনিয়া।

ববের গাড়িতে উঠে দরজা বন্ধ করার পর শান্ত হলেন মিস ভারনিয়া। নেতিয়ে পড়লেন গাড়ির সিটে।

মুসা আর কিশোরের অস্বস্তি বাড়ছে। থিয়েটারের ওপরতলায় এখন রয়েছে ওরা। লুকানর জায়গা খুঁজে পায়নি। নিতান্ত দরকার না পড়লে টর্চ জ্বালছে না। বাতাসে যেন জমাট বেঁধে আছে পুরানো ভ্যাপসা গন্ধ। দানোরা আসছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না, কোনরকম সাড়াশব্দ নেই কোথাও।

লম্বা করিডর ধরে একটা দরজার কাছে এসে দাঁড়াল দুই গোয়েন্দা, ঠেলা দিতেই খুলে গেল পাল্লা। ভেতরে ঢুকল ওরা। দরজাটা আবার বন্ধ করে দিয়ে টর্চ জ্বালল মুসা।

ঘরের ঠিক মাঝখানে মস্ত বড় দুটো মেশিন বসানো রয়েছে। প্রাচীন আমলের সিনেমা-প্রোজেকটর, ধুলো-ময়লায় একাকার, মরচে পড়ে বাতিল লোহায় পরিণত হতে চলেছে।

'আরি, সিনেমাও দেখানো হত নাকি! এহ্, যা মেশিন!' মুখ বাঁকাল মুসা, 'মিউজিয়ামে রাখার উপযুক্ত!' কিশোরের দিকে ফিরল। 'এ-ঘরেই লুকিয়ে থাকা

যাক।'

'বড় বেশি খোলামেলা! কতক্ষণ থাকতে হবে কে জানে! বিপদে পড়ব শেষে।'

'পড়ব মানে কি? পড়েই তো আছি। বরং বল, বিপদ আরও বাড়বে।'

'চল, অন্য জায়গা খুঁজি। এখানে লুকানো যাবে না।'

প্রোজেকশন রুমের পাশে একটা হলে এসে ঢুকল ওরা। ঘরের এক প্রান্ত থেকে একটা সিঁড়ি উঠে গেছে ছোট একটা প্ল্যাটফরমে, ওটাতে উঠে এল দু'জনে। সামনে একটা দরজার গায়ে লেখাঃ

'মিনারেট'

প্রবেশ নিষেধ

'মিনারেট! কোনরকম দানব-টানব?' মুসা অবাক।

'তুমি বোধহয় মাইনোটারের কথা ভাবছ? গ্রীক মিথোলোজির ষাঁড়মাথা দানব,' কিশোর বলল। 'এটা মাইনোটার নয়, মিনারেট, টাওয়ারের ওপরের খোলা জায়গা। চল, ওখানেই উঠে পড়ি। একটা বুদ্ধি এসেছে,' দরজায় ঠেলা দিল কিশোর।

লোহার পাল্লা, মরচে পড়ে শক্ত হয়ে আটকে আছে। দু'জনে মিলে জোরে ধাক্কা দিতেই শব্দ করে খুলে গেল। খুব সরু একটা লোহার মই উঠে গেছে দরজার ওপাশ থেকে। মই বেয়ে উঠতে শুরু করল ওরা।

মিনিটখানেক পরে টাওয়ারের চারকোণা একটা খোলা জায়গায় এসে উঠল ওরা। অনেক নিচে রাস্তা, নির্জন, শুধু পথের ধারের লাইটপোস্টগুলো প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে।

'মিনারেটে তো উঠলাম,' বলল মুসা, 'এবার? এখান থেকে আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। আরও ভালমত আটকা পড়লাম।'

'আটকা আর পড়লাম কোথায়?' পথের দিকে চেয়ে আছে কিশোর। 'নিচেই রাস্তা, ওখানে কোনমতে নেমে যেতে পারলেই হল। মাত্র পঁচাত্তর ফুট।'

'মাত্র পঁচাত্তর ফুট! লাফিয়ে নামব নাকি?'

'কেন, সঙ্গে দড়ি আছে না?' দড়ির বাণ্ডিল খুলে নিল কিশোর। 'পাকিয়ে মোটা করে নিয়েছিলাম। পাক খুললেই অনেক লম্বা হয়ে যাবে। হলেও তোমার ডবল ওজন সইতে পারবে।'

'আমার? আমার কেন? তোমার নয় কেন?'

'কারণ, তোমার মত ভাল অ্যাথলেট নই আমি,' শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর। 'আমি চেষ্টা করলে বড়জোর পড়ে গিয়ে হাত-পা ভাঙতে পারি, এর বেশি কিছু করতে পারব না, কিন্তু তুমি নিরাপদে নেমে যেতে পারবে। ওই যে, অনেক শিক বেরিয়ে আছে। ওগুলোর কোনটায় দড়ি বেঁধে দিচ্ছি, নেমে গিয়ে পুলিশ ডেকে

নিয়ে এস। মিস ভারনিয়ার জন্যে অপেক্ষা করলে চলবে না।'

দ্রুত দড়ির পাক খুলে ফেলল কিশোর।

টেনেটুনে দড়িটা দেখল মুসা। 'বেশি সরু, পিচ্ছিল। ধরে রাখাই মুশকিল হবে। হাতে কেটে বসে যাবে।'

'যাবে না। দস্তানার তালুতে চামড়া রয়েছে, সহজে কাটবে না। হাতের কব্জিতে এক পাক দিয়ে ঝুলে পড়বে দড়ি ধরে, তারপর আস্তে আস্তে ছাড়লেই সরসর করে নেমে যেতে পারবে।'

হাতে দড়ি পেঁচিয়ে টেনেটুনে দেখল মুসা। মাথা ঝাঁকাল। 'হ্যাঁ, পারব মনে হচ্ছে। কিন্তু একটা কথার জবাব দেবে?'

'কি?' শিঁকে দড়ি বাঁধছে কিশোর।

'রক্তদানো আমরা সত্যি দেখলাম তাহলে?'

'খুদে মানুষ দেখলাম,' মুখ তুলল কিশোর। 'আমি একটা আস্ত গাধা! আমার ধারণা ছিল, মিস ভারনিয়াকে ভয় দেখিয়ে তাড়ানর চেষ্টা করছে ওরা, যাতে উনি বাড়ি বিক্রি করে দেন। বুঝতেই পারিনি সত্যি সত্যি গুপ্তধনের জন্যে মাটি খুঁড়ছে ওরা।'

'গাধা! অযথা গালমন্দ করছ নিজেকে। তুমি কেন, কেউই বুঝতে পারত না তখন, মিস ভারনিয়ার বাড়ির তলায় গুপ্তধন খুঁজছে দানোরা।'

'মিস ভারনিয়ার বাড়ির তলায় নয়,' মুসা এখনও বুঝতে পারছে না দেখে বিরক্ত হল কিশোর। 'এখান থেকে সব চেয়ে কাছের গুপ্তধন কোথায়?'

'হবে হয়ত, পাহাড়ের তলায় কোথাও?'

'তোমার মাথা! কেন, ব্যাংকটা চোখে পড়ে না?'

'ব্যাংক?' বোকা হয়ে গেছে যেন মুসা। 'মানে?'

হাল ছেড়ে দিল কিশোর, 'এত কথা বলার সময় নেই এখন। যাও, নাম। যে-কোন সময় ব্যাটারা এসে পড়তে পারে। সাবধান, বেশি তাড়াহুড়ো কোরো না।'

কিশোর যেভাবে বলেছে ঠিক সেভাবে নামা সম্ভব হল না, দড়ি ধরে ঝুলে বাঁকা হয়ে দেয়ালে পা ঠেকিয়ে নামতে লাগল মুসা। নিচের দিকে তাকাল না একবারও।

অর্ধেকটা মত নেমেছে মুসা, এই সময় ওপরে চিৎকার শুনল। একবার গুঙিয়ে উঠল কিশোর, তারপরেই চুপ হয়ে গেল। ধড়াস করে এক লাফ মারল মুসার হৃৎপিণ্ড। কিশোরকে কি ধরে ফেলেছে···প্রচণ্ড জোরে দড়িতে নাড়া লাগল, আকেটু হলে হাতই ছুটে গিয়েছিল মুসার। শক্ত করে দড়ি আঁকড়ে ধরল সে।

'এই যে বিচ্ছু!' শোনা গেল বার্টের কর্কশ গলা। 'নিচে নামছে। হ্যাঁ, তোমাকে বলছি।'

ঢোক গিলল মুসা। আবার নাড়া লাগল দড়িতে। প্রাণপণে দড়ি ধরে রইল

সে। 'ব-বল!'

'উঠে এস।'

'নিচে নামছি তো!' নিজের কানেই বেখাপ্পা শুনাল মুসার কথা।

'হঠাৎ নেমে যাবে কিন্তু!' ধমকে উঠল বার্ট। দড়ি কেটে দেব।'

নিচে তাকাল মুসা। আর বড় জোর তিরিশ ফুট বাকি, ঘাস থাকলে লাফিয়ে পড়তে পারত। কিন্তু কংক্রিটে বাঁধানো কঠিন পথ, দুই পায়ের হাড় কয়েক টুকরো হয়ে যাবে এখান থেকে লাফ দিলে।

'কি হল বিচ্ছু? নড়ছ না কেন? তিন পর্যন্ত গুনব, তারপর দেব দড়ি কেটে?'

'দাঁড়াও দাঁড়াও, গোনার দরকার নেই!' চেঁচিয়ে বলল মুসা। 'আমি উঠে আসছি। দড়ি পিছলে যেতে চায়, শক্ত করে ধরে নিই।'

'ঠিক আছে। কিন্তু কোন রকম চালাকি চাই না।'

একটা বুদ্ধি এসেছে মুসার মাথায়। তেমন কিছুই নয়, তবে এতে কাজ হলেও হতে পারে। ডান হাতে দড়ি ধরে ঝুলে থেকে দাঁতে কামড়ে ডান হাতের দস্তানা খুলে ফেলল। পকেট হাতড়ে নীল চক বের করে ময়লা দেয়ালে বড়সড় একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন আঁকল। নিচে ফেলে দিল বাকি চকটা।

'আরে অই বিচ্ছু!' অধৈর্য হয়ে পড়েছে বার্ট। 'উঠছ না কেন? দেব নাকি দড়ি কেটে?'

'এই যে আসছি, আসছি!'

নামার চেয়ে ওঠা অনেক বেশি কঠিন। অনেক কষ্টে মিনারেটের কাছাকাছি উঠে এল মুসা। তাকে ধরে তুলে নিল দুটো বলিষ্ঠ হাত।

বার্ট ছাড়াও আরও দু'জন রয়েছে মিনারেটে, কিশোরকে চেপে ধরে রেখেছে দু'দিক থেকে।

মুসার পিঠে কনুই দিয়ে গুতো মারল বার্ট। 'আগে বাড়।'

অনেক সিঁড়ি, অনেক মোড়, গলিঘুঁজি আর করিডর পার করে নিচের তলার একটা ঘরে নিয়ে আসা হল দুই গোয়েন্দাকে। কংক্রিটের এবড়োখেবড়ো দেয়াল, এক পাশে বড় বড় দুটো মরচে-পড়া বয়লার পড়ে আছে। থিয়েটারের হল রুম গরম রাখার কাজে ব্যবহৃত হত নিশ্চয় ওগুলো, ভাবল মুসা।

একপাশের দেয়ালে কয়েকটা বন্ধ দরজা। প্রথম দরজাটার গায়ে লেখাঃ কোল বিন নং ১, তারপরে কোল বিন নং ২, এবং কোল বিন নং ৩। রঙ চটে গেছে, কোনমতে পড়া যায় শব্দগুলো। মুসা বুঝল, ওগুলো কয়লা রাখার ঘর।

এক নাম্বার ঘরের দরজা খুলে ছেলেদেরকে ভেতরে ঠেলে দিল বার্ট।

বিস্ময়ে ঘোঁৎ করে উঠল মুসা। এক কোণে বসে তাস খেলছে সেই চার রত্নদানো। একবার চোখ তুলে চেয়েই আবার খেলায় মন দিল ওরা। অনেকগুলো কোদাল, গাঁইতি আর শাবল ফেলে রাখা হয়েছে এক ধারে মেঝেতে। কয়েকটা

বড় বৈদ্যুতিক লণ্ঠনও আছে। কিন্তু সব চেয়ে বেশি অবাক হল মুসা কংক্রিটের দেয়ালে একটা কালো ফোকর দেখে। নিশ্চয় মাটির নিচে রয়েছে দেয়ালের ওই অংশ, কারণ ফোকরটার ওপাশে কালো সুড়ঙ্গমত দেখা যাচ্ছে।

দ্রুত চিন্তা চলেছে মুসার মাথায়। তার মনে হল, সুড়ঙ্গটা গেছে মিস ভারনিয়ার বাড়ির দিকে। নাকি বাড়ির তলা দিয়ে অন্য কোথাও চলে গেছে? চকিতে বুঝে গেল কিশোরের কথার মানে, গুপ্তধনের সন্ধানে সুড়ঙ্গ খুঁড়ছে···ব্যাংক···হ্যাঁ, ব্যাংকে গুপ্ত রয়েছে ওই ধন!

তিনজন লোক আর ওই চারটে অদ্ভুত জীব আসলে ডাকাত। ব্যাংক ডাকাতির পরিকল্পনা করেছে ওরা!

তেরো

কিংক্রিটের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে একগাদা বস্তার ওপর বসেছে মুসা আর কিশোর। দু'জনেরই হাত-পা বাঁধা। মুখ খোলা, ইচ্ছে করলে কথা বলতে পারে, কিন্তু কথা বলার প্রবৃত্তি হচ্ছে না কিশোরের।

ডাকাতদের কাজকর্ম দেখছে মুসা। বার্টকেই নেতা বলে মনে হচ্ছে, অন্য দু'জন, জিম আর রিক তার সহকারী। বেঁটে বলিষ্ঠদেহী লোকটার নাম জিম। রিকের ইয়া বড় গোঁফ, রোগাটে শরীর, কথা বললেই লণ্ঠনের আলোয় ঝিক করে উঠছে ওপরের পাটির একটা সোনায় বাঁধানো দাঁত।

'কিশোর,' ফিসফিস করে বলল মুসা। 'বার্ট ব্যাংক ডাকাত, না? মিস্টার রবার্টের নাইটগার্ডের কাজ নিয়েছে সে ইচ্ছে করেই, ডাকাতি করার জন্যে।'

'হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছ,' নিচু গলায় বলল কিশোর। 'শুরুতেই ব্যাপারটা বোঝা উচিত ছিল আমার। দুটো গুরুত্বপূর্ণ সূত্রও ছিল। গাঁইতি দিয়ে মাটি কোপানর শব্দ আর কাছেই একটা ব্যাংক। অথচ কি করলাম? গাধার মত রত্নদানোর দিকে নজর দিয়ে বসলাম।'

'তোমার কি দোষ?' সান্ত্বনা দিল মুসা। 'স্বয়ং শার্লক হোমসও আগে থেকে ব্যাপারটা বুঝতে পারত না। চমৎকার বুদ্ধি করেছে ব্যাটারা! রত্নদানোর দিকে নজর ফিরিয়ে রেখেছে আমাদের, বুঝতেই দেয়নি আসল কথা। আচ্ছা, কিশোর, একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না, দানো ব্যাটারা তাস খেলছে, ওদিকে তিন ডাকাত কাজ করতে করতে ঘেমে উঠেছে।'

'সুড়ঙ্গ খোঁড়ার জন্যে ডাকা হয়নি ওদেরকে,' ক্ষোভ প্রকাশ পেল কিশোরের কথায়। 'ওদেরকে ভাড়া করা হয়েছে মিস ভারনিয়াকে ভয় দেখানর জন্যে, যেন তাঁর কথা লোকে বিশ্বাস না করে সেজন্যে।'

'অ-অ, বুঝেছি। কিন্তু রত্নদানোদের খোঁজ পেল কি করে বার্ট আনল

কোত্থেকে? ব্ল্যাক ফরেস্ট থেকে?'

'হায়রে কপাল!' হতাশ ভঙ্গিতে এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল কিশোর। 'ব্ল্যাক ফরেস্ট থেকে আমদানি করতে যাবে কেন? ওদেরকে আনা হয়েছে রূপকথার পাতা থেকে। আঙিনায় ব্যাটাদেরকে নাচতে দেখেই সেটা অনুমান করেছিলাম।'

কিশোরের কথা আরও দুর্বোধ্য লাগল মুসার কাছে, কিন্তু বকা শোনার ভয়ে আর প্রশ্ন করল না, চুপ করে ভাবতে লাগল। মিস ভারনিয়ার লেখা বইয়ের পাতা থেকে? কি মানে এর?

ডাকাতদের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। সুড়ঙ্গের শেষ মাথা কাটা চলছে এখন। আলগা মাটি ঝুড়িতে করে ফেলে দিয়ে যাচ্ছে সুড়ঙ্গমুখের বাইরে।

'আর মাত্র ফুট দশেক, রিক,' জিমকে বলতে শুনল মুসা।

'ওই দশ ফুটেই তো জান বের করে ছাড়বে!' বলল রিক।

মাটি ফেলতে এসেছিল, ঝুড়ি নিয়ে আবার ভেতরে ঢুকে গেল দু'জনে।

আরেকটা প্রশ্ন জাগল মুসার মনে। 'কিশোর...' বলতে বলতেই থেমে গেল সে। বস্তার ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছে গোয়েন্দাপ্রধান। ঘুমিয়ে পড়েছে।

দেখ, কাণ্ড কিশোরের!—অবাক হয়ে ভাবল মুসা। কোথায় মগজ খাটিয়ে এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা করবে, তা না, ঘুমিয়ে পড়েছে। তারপরই মনে হল মুসার, সামনে রাতের অনেকখানি পড়ে আছে। পালানর চেষ্টা করতে হলে শক্তি সঞ্চয় করা দরকার তাদের। যেইমাত্র সুড়ঙ্গ খোঁড়া শেষ হবে, ব্যাংকের ভল্ট থেকে টাকা নিয়ে পালাবে ডাকাতেরা। ততক্ষণ ঘুমিয়ে নিতে পারলে মন্দ কি? ঠিক কাজই করেছে কিশোর।

মুসাও শুয়ে পড়ল। মন থেকে দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলতেই ঘুম এসে গেল তার চোখেও।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছে, বলতে পারবে না মুসা, কিন্তু এখন বেশ ঝরঝরে লাগছে শরীরটা। তবে হাত-পায়ের যেখানে যেখানে দড়ি বাঁধা, সেখানে টনটন করছে।

কাছেই কথা বলছে কেউ। উঠে বসে ফিরে চেয়ে দেখল মুসা, কিশোরের হাতে এক কাপ সুপ। তার পাশে একটা বাক্সের ওপর বসে আছে বার্ট। কিশোরের চেহারায় কেমন একটা খুশি খুশি ভাব।

মাটি কোপানর শব্দ শোনা যাচ্ছে না আর, বোধহয় সুড়ঙ্গ খোঁড়া শেষ হয়ে গেছে। ঘরের কোণে বসে স্যাণ্ডউইচ খাচ্ছে রত্নদানোরা। রিক আর জিমকে দেখা যাচ্ছে না। সুড়ঙ্গের দিকে তাকাতেই মোটা বৈদ্যুতিক তারটা চোখে পড়ল মুসার, সাপের মত এঁকেবেঁকে ঢুকে গেছে সুড়ঙ্গের ভেতরে। মোটরের আবছা গুঞ্জন কানে আসছে। ও, বোঝা গেছে, মেশিন দিয়ে ভল্টের কংক্রিটের দেয়ালে ছিদ্র করছে জিম আর রিক।

'গুড মর্নিং, মুসা,' হেসে বলল কিশোর। 'ঘুম ভাল হয়েছে তো?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়, স্বপ্নে এক রাজকুমারীকে বিয়েও করে ফেলেছি।' ব্যঙ্গ ঝরল মুসার কথায়। এই বিপদের সময়ে কিশোরের হাসি আসছে কিভাবে বুঝতে পারছে না সে। কিশোরের কাপের দিকে আবার চোখ পড়তেই স্বর নরম করে ফেলল, 'কিশোর, আর কাপ নেই? মানে, সুপ দেয়া হবে না আমাকে?'

মুসার কথার ধরনে হো হো করে হেসে উঠল বার্ট। মুসাকেও এক কাপ সুপ দিল। 'বিচ্ছু ছেলে! তবে এখানে আর ইবলিসগিরি করতে পারবে না, ভালমত আটকেছি।'

'তোমরাও কম ইবলিস নাকি?' যেন ঘরোয়া আলাপ-সালাপ করছে কিশোর, এমনি ভাব। 'প্রথমে তো পুরো বোকা বানিয়ে দিয়েছিলে আমাদেরকে। আঙিনায় তোমার পাঠানো দানোগুলোকে দেখে প্রথমে ভেবেছিলাম, ওটা ববের কাজ। ফুফুকে ভয় পাইয়ে বাড়ি থেকে তাড়ানর জন্যে ওই ফন্দি করেছে। তারপরে, ওরা যখন থিয়েটারের ভেতরে এসে ঢুকল, তখন বুঝলাম আসল ঘটনাটা।'

'আরেকটু হলেই দিয়েছিলে আমাদের বারোটা বাজিয়ে,' দু'আঙুলে চুটকি বাজাল বার্ট। 'পুলিশ তো প্রায় নিয়েই এসেছিলে,' মুসার দিকে ফিরে বলল, 'চেহারা হাবাগোবার মত করে রাখলে কি হবে, ভীষণ চালাক তোমার বন্ধু। তবে এই অভিনয়টা খুব কাজে লাগবে। লোকে সন্দেহই করতে পারবে না। ওকে আমি ভালমত ট্রেনিং দিয়ে দেব। দশ বছরেই দুনিয়ার সেরা ক্রিমিন্যাল হয়ে উঠবে ও।'

'ধন্যবাদ, ক্রিমিন্যাল হতে চাই না আমি,' মোলায়েম গলায় বলল কিশোর। 'ক্রিমিন্যালদের পরিণতি খুব খারাপ হয়।'

'বলে কি ছেলে! আরে খোকা, তুমি জান, কার সঙ্গে কথা বলছ? দেশের সবচেয়ে ঝানু ক্রিমিন্যালদের একজনের সঙ্গে। মাথায় ঘিলু থাকলে সারা জীবন অপরাধ করে বেড়াতে হয় না। প্রচুর পরিশ্রম করে বুদ্ধি খাটিয়ে ভালমত একটা দান মেরে দিতে পারলেই বাকি জীবন বসে খাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে যায়। ঠিক আছে, তোমার ইচ্ছে। আমার সঙ্গে থাকতে না চাইলে কি আর করব? খারাপ কাজটাই করতে হবে আমাকে।'

বার্টের কথার মানে বুঝতে পারল না মুসা, কিন্তু কেন যেন শিরশির করে উঠল তার মেরুদণ্ডের ভেতরটা।

'অনেক কথা জানার আছে মুসার,' তাড়াতাড়ি বলে উঠল কিশোর। 'মিস্টার বার্ট, এই ব্যাংক ডাকাতির পরিকল্পনা কি করে করলেন, খুলেই বলুন না সব ওকে।'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়,' সুপের জগ তুলল বার্ট। 'আরেক কাপ নেবে?'

'আমার আর লাগবে না। মুসাকে দিন।'

মুসার কাপ ভরতি করে সুপ ঢেলে দিল বার্ট। 'হ্যাঁ, গোড়া থেকেই বলি,' জগ নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল সে। 'এই ব্লকের পাশের ব্লকটাতেই আমার বাড়ি।

বছর চল্লিশেক আগে মিস ভারনিয়ার এক রত্নদানো ছিলাম আমিও।' দাঁত বের করে হাসল বার্ট। 'আমাকে দানো কল্পনা করতে কেমন লাগছে?' প্রশ্নের জবাবের অপেক্ষা না করেই বলল, 'হপ্তায় একবার করে পাড়ার যত ছেলেমেয়েকে নিয়ে পার্টি দিত মিস ভারনিয়া। আইসক্রীম খাওয়াত, কেক খাওয়াত, তারপর তার বই থেকে গল্প পড়ে শোনাত।'

বার্টের কাছে জানা গেল, তার বাবা ছিল রাজমিস্ত্রী, এই মুরিশ থিয়েটার আর পাশের ব্যাংকটা বানাবার সময় এখানে কাজ করেছিল। বাবার কাছেই ব্যাংকের ভল্টের কথা শুনেছে বার্ট। ওটার দরজা ইস্পাতের, কিন্তু দেয়াল তৈরি হয়েছে ক্রংক্রীট দিয়ে। মাটির অনেক গভীরে তৈরি হয়েছে ভল্ট, তাই ইস্পাতের দেয়াল দেয়ার কথা ভাবেনি ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। এই সুযোগটাই নিয়েছে বার্ট।

'ওরা ভাবেনি, কিন্তু আমি ভেবেছি,' বলল বার্ট। 'ইচ্ছে করলেই ওই ভল্ট থেকে টাকা লুট করা যায়। মিস ভারনিয়ার ভাঁড়ার থেকে সুড়ঙ্গ খোঁড়া শুরু করলে মাটির তলা দিয়েই পৌঁছে যাওয়া যায় ভল্টের কাছে। তারপর কংক্রিটের দেয়াল ভেঙে ফেলাটা কোন কাজই না।

'তখন এই এলাকায় ভাঙচুর শুরু হয়েছে। বসতবাড়ি বিক্রি করে দিয়ে চলে যাচ্ছে লোকে। আমি ভাবলাম, মিস ভারনিয়াও চলে যাবে, কিন্তু গেল না সে। অপেক্ষা করে করে বিরক্ত হয়ে উঠলাম। এই সময়েই একদিন শুনলাম, থিয়েটার বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। মালিকানা হাত বদল হয়ে গেছে। নতুন আইডিয়া এল মাথায়। থিয়েটার-হাউসের নিচতলার কোন একটা ঘর থেকে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে মিস ভারনিয়ার বাড়ির নিচ দিয়ে পৌঁছে যাওয়া যায় ব্যাংকের ভল্টে। তখুনি কাজে লেগে যেতাম, কিন্তু একটা অপরাধের জন্যে ধরা পড়লাম পুলিশের হাতে, কয়েক বছর জেল হয়ে গেল।

'জেলে বসে একের পর এক প্ল্যান করেছি। জেল থেকে ছাড়া পেয়েই কাজে নেমে পড়লাম। খুঁজে খুঁজে লোক জোগাড় করে একটা দল গড়লাম। থিয়েটার হাউসে তখন দু'জন নাইটগার্ড। রাতে বিচিত্র শব্দ করে ভয় দেখিয়ে ওদেরকে তাড়ালাম। নতুন নাইটগার্ড দরকার মিস্টার রবার্টের। তার কাছে গিয়ে চাকরি চাইতেই চাকরি হয়ে গেল।'

কি করে রাতের পর রাত দুই সঙ্গীকে নিয়ে সুড়ঙ্গ খুঁড়েছে বার্ট, সব বলল। আলগা মাটি ঝুড়িতে করে বয়ে এনে ফেলেছে কয়লা রাখার ঘরগুলোতে। কয়লার ঘরে কয়লা কিংবা জঞ্জাল ছাড়া আর কিছুই থাকতে পারে, ভাবেনি মিস্টার রবার্ট, তাই ওই ঘরগুলোতে ঢোকেনি। ফলে সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়েনি তার।

'অ। মিস্টার রবার্ট তাহলে নেই এসবে,' বলল কিশোর। 'আমি ভেবেছিলাম সে-ও জড়িত।'

'না, সে নেই এতে। একমাত্র সমস্যা হল মিস ভারনিয়াকে নিয়ে। রাতে মাটি

কোপানর শব্দ তার কানে যাবেই। পুলিশকে গিয়ে বলে দিতে পারে। তাই কয়েকটা রত্নদানো আমদানি করতে হল। পুলিশকে বলল মিস ভারনিয়া, রাতে রত্নদানোরা মাটি কোপায়। তার কথা হেসেই উড়িয়ে দিল পুলিশ। আর বেশি চাপাচাপি করলে হয়ত মানসিক হাসপাতালেই পাঠাত,' হা হা করে হাসল বার্ট। 'ভাবলাম, এরপর ভয়ে বাড়ি ছেড়ে দেবে মিস ভারনিয়া। ভয় পেল ঠিকই, কিন্তু বাড়ি ছাড়ল না। তোমাদের সাহায্য চেয়ে বসল। আমার সবকিছু প্রায় ভেস্তে দিয়েছিলে তোমরা, অল্পের জন্যে বেঁচে গেছি।'

'যদি মিস ভারনিয়ার ভাইপো বব বিশ্বাস করে বসত?' প্রশ্ন রাখল কিশোর। 'যদি সে রাতে ফুফুর বাড়িতে থাকত, মাটি কোপানর শব্দ শুনত? দু'জনের কথা হেসে উড়িয়ে দিতে পারত না পুলিশ।'

মিটিমিটি শয়তানি হাসি হাসল বার্ট। 'এত কাঁচা কাজ কি আমি করি? ববের সঙ্গে আগেই ভাব করে নিয়েছি।'

'ভাব!' বুঝতে পারছে না মুসা

'হ্যাঁ। ওকে বলেছি, মিস্টার রবার্ট মিস ভারনিয়ার বাড়িটা কিনতে চায়, কিন্তু মহিলা বেচতে রাজি নয়। তাই ভয় দেখানর ছোট্ট একটা ব্যবস্থা করেছে মিস্টার রবার্ট। বব যেন তার ফুফুকে সাহায্য না করে, এমন ভাব দেখায়, যেন ফুফুর মাথায় গোলমাল দেখা দিয়েছে। বব তো এক পায়ে খাড়া। ফুফু বাড়ি বেচলে তার লাভ। পটিয়ে মোটা টাকা নিয়ে নিতে পারবে ফুফুর মৃত্যুর আগেই।' হাসল বার্ট।

'ইয়াল্লা, কিশোর।' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'বব সত্যিই তাহলে আছে এর মাঝে!'

'আগেই সন্দেহ করেছ নাকি তোমরা?' ভুরু কোঁচকাল বার্ট। 'চালু ছেলে। আবার বলছি, আমার দলে চলে এস। পুলিশের মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিতে পারব আমরা তাহলে।'

'কিন্তু...,' চিন্তিত দেখাচ্ছে কিশোরকে। ভয় পেয়ে গেল মুসা, সুপার ক্রিমিন্যাল হওয়ার লোভ না আবার পেয়ে বসে গোয়েন্দাপ্রধানকে। তার ভয়কে সত্য প্রমাণ করার জন্যেই যেন কিশোর বলল, 'ঠিক আছে, আরও ভেবে দেখতে হবে আমাকে। সামান্য সময় দরকার।'

'আরে নিশ্চয়, নিশ্চয় সময় দেয়া হবে,' হেসে বলল বার্ট। 'যাই দেখি, জিম আর রিক কতদূর কি করল।'

যাওয়ার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল বার্ট, ডেকে তাকে ফেরাল মুসা। 'একটা কথা। ওই রত্নদানো আমদানি করা হল কোত্থেকে? মানুষের কথা শুনতে রাজি হল কি করে ওরা?'

শব্দ করে হাসল বার্ট। 'সেটা ওদেরকেই জিজ্ঞেস কর।' হাত তুলে ডেকে বলল, 'এই বিচ্ছুরা, এদিকে এস। তোমাদের সঙ্গে আলাপ করতে চায় এরা,' বলে

আর দাঁড়াল না।

উঠে দাঁড়াল একটা দানো। লাল জ্বলজ্বলে চোখ, ময়লা দাড়ি। অদ্ভুত ভঙ্গিতে হেলেদুলে হেঁটে এসে দাঁড়াল সে ছেলেদের সামনে। 'কি হে ইবলিসেরা, কি বলবে? এহ্, মেলা জ্বালান জ্বালিয়েছ। হাতটা প্রায় ভেঙেই দিয়েছিলে আমার। কিন্তু মাপ করে দিয়েছি, জানি তো কপালে অনেক দুঃখ আছে তোমাদের। লম্বা সাগরপাড়ি দিতে হবে।'

ভাল ইংরেজি বলে দানোটা। ম্লান আলোয় যতখানি সম্ভব ভাল করে ওটাকে দেখল মুসা। লাল চোখ, চোখা রোমশ কান, কুচকুচে কালো রোমশ বড় বড় হাত, পৃথিবীর ওপরে থাকলে এই জীব মানুষের অগোচরে থাকতে পারত না কিছুতেই। মাটির তলায় লুকিয়ে থাকে বলেই লোকের চোখে পড়ে না।

'তুমি কি সত্যিই রত্নদানো?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

হাসল দানোটা। 'খুব জানতে ইচ্ছে করছে, না?' টান দিয়ে রোমশ একটা কান খুলে আনল সে। অবাক হয়ে দেখল মুসা, কানটা নকল, আসল কানের ওপর বসানো ছিল।

এরপর টান মেরে রোমশ বিশাল একটা হাত খুলে আনল দানো। বেরিয়ে পড়ল ছোট একটা হাত, বাচ্চাছেলের হাতের চেয়েও ছোট। আসল পাটির ওপর থেকে খুলে আনল নকল দাঁত। তারপর চোখে হাত দিল। সাবধানে এক চোখের ওপর থেকে সরাল পাতলা একটা জিনিস। হেসে বলল, 'দেখলে তো খোকা, লাল চোখও নেই, চোখা দাঁতও নেই।' লোকটার একটা চোখের মণি এখন স্বাভাবিক নীল। চোখের ওপর থেকে সরানো জিনিসটা দেখিয়ে বলল, 'টিনটেড কনট্যাক্ট লেন্স।' নাকে আঙুল ছোঁয়াল। 'নকল নাক।' দাড়িতে হাত দিল, 'নকল দাড়ি। রত্নদানোর ছবি দেখে তৈরি করা হয়েছে প্রতিটা জিনিস। আসলে আমি একজন বামন, খোকা।'

'অনুমান করেছি,' বলল কিশোর। 'তবে দেরিতে।'

'হ্যাঁ, বড্ড দেরি করে ফেলেছ। আজ আমাদের কাজ শেষ হয়ে যাবে। আগামীকাল রোববার, সোমবারের আগে কেউ কিছু জানতে পারবে না।'

'মিস ভারনিয়া আমাদেরকে না দেখলে পুলিশে খবর দেবেন,' গলায় জোর পাচ্ছে না কিশোর।

'দেবে না,' মাথা নাড়ল বামন। 'এতক্ষণে তার ভাইপোর বাড়িতে পৌঁছে গেছে। কাঁচা কাজ করি না আমরা, খোকা। আগামী চব্বিশ ঘন্টার আগে কেউ জানতেই পারবে না ব্যাংকটা লুট হয়েছে।'

কপালে চিকন ঘাম দেখা দিয়েছে মুসার। কিছু একটা বলতে মুখ খুলল, কিন্তু বলা হল না, ঘরে এসে ঢুকল বার্ট। 'ভল্টে ঢোকার পথ হয়ে গেছে।' বামনদের সর্দারকে বলল, 'তুমি এখানে থাক।' অন্য তিন বামনকে দেখিয়ে বলল, 'ওদেরকে

নিয়ে ভল্টে যাচ্ছি আমি, কাজ আছে।'

'আমিও সঙ্গে আসব?' কিশোর জিজ্ঞেস করল। 'কি করে কাজ সারেন আপনারা, দেখতে ইচ্ছে করছে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, এস। কাজ দেখার পর ভক্তি এসেও যেতে পারে। হয়ত তখন আমাদের দলে যোগ দিতে আর দ্বিধা থাকবে না।'

কিশোরের পায়ের বাঁধন কেটে দেয়া হল। বার্ট আর তিন বামনের পিছু পিছু সুড়ঙ্গে গিয়ে ঢুকল সে। মুসা বসে রইল আগের জায়গায়।

'খুব বোকা বানিয়েছি তোমাদের!' হাসল বামনটা। 'জানালায় টোকা দিলাম, যাতে আমার দিকে ফিরে চাও। জানতাম তাড়া করবে, করলেও, থিয়েটার হাউসে তোমাদেরকে নিয়ে আসতে কোন অসুবিধে হল না।'

'কিন্তু এখানে আনার কোন দরকার ছিল?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'ছিল। মাটি খোঁড়ার শব্দ শুনে সন্দেহ জাগতই তোমাদের, পুলিশ ডেকে নিয়ে আসতে হয়ত। অহেতুক কেন ঝুঁকি নিতে যাব? তার চেয়ে তোমাদেরকে আটকে ফেলাটাই কি ভাল হয়নি?'

'কিন্তু তাতেই কি ঝুঁকি চলে গেল? পুলিশ কি পরেও ধরতে পারবে না তোমাদেরকে? বামনদের সহজেই খুঁজে বের করা যাবে। পুলিশকে গিয়ে সব বলব আমরা, তারা তোমাদেরকে খুঁজে বের করবেই।'

'যদি গিয়ে বলতে পার তবে তো?' রহস্যময় হাসি হাসল বেঁটে মানুষটা। 'আর পুলিশ এলেই বা কি? ওটা হলিউড, ওখানে ছবি বানানো হয়।

'তাতে কি?'

'তাতে অনেক কিছু। সারা দুনিয়ায় যত বামন আছে, তার অর্ধেক রয়েছে ওই হলিউডে। ওখানকার অনেকেই সিনেমা কিংবা টেলিভিশনে অভিনয় করে, ডিজনিল্যাণ্ডে কাজ করে। বেকারও রয়েছে অনেক। আমিও বেকার, বামনদের একটা বোর্ডিং হাউসে থাকি। ওখানে আরও তিরিশ-বত্রিশ জন থাকেন। বেকারদেরও পেট আছে, তাদেরও বাঁচতে ইচ্ছে করে, তাই সব সময়ই নানারকম কাজের ধান্ধায় থাকি আমরা। লোকের বাড়ির স্কাইলাইটের ভেতর দিয়ে কিংবা জানালা খুলে ঢুকে যাই ভেতরে, টুকটাক জিনিস নিয়ে কেটে পড়ি। বড় ধরনের কাজও মিলে যায় মাঝে মাঝে, এখন যা করছি। আকার ছোট হওয়ায় আমাদের অনেক সুবিধে। এমন অনেক কাজ আমরা অনায়াসেই করতে পারি, স্বাভাবিক মানুষ যা পারে না।'

'স্বাভাবিক মানুষ আমাদের সম্পর্কে যা খুশি ভাবে ভাবুক, কিন্তু আমরা সুখেই আছি। এক বোর্ডিং হাউসে অনেকে মিলে এক পরিবারের মত থাকি, কেউ কারও বিরুদ্ধে কিছু করি না। বাইরের কেউ আমাদের কারও সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করতে এলে আমরা কেউ কিচ্ছু জানি না কিচ্ছু দেখিনি, শুনিনি, কিচ্ছু অনুমান করতে পারি

না।' নকল কানটা আবার জায়গামত বসিয়ে দিল বামনটা। 'কাজেই আমাদেরকে খুঁজে বের করতে পারবে না পুলিশ। তোমরাও আমাদের আসল চেহারা দেখনি, চিনিয়ে দিতে পারবে না।' উঠে দাঁড়াল সে। 'যাই, দেখি, ওদিকে কদ্দূর হল।'

সুড়ঙ্গে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল বামনটা।

কংক্রিটের দেয়ালের বাইরে একটা গুহায় দাঁড়িয়ে আছে কিশোর। দেয়ালে একটা ফোকর করা হয়েছে, ছোট একটা ছেলে ঢুকতে পারবে ওই পথে। দরদর করে ঘামছে শ্রান্ত জিম আর রিক। রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছছে।

'ফোকরটা আরও বড় করা যায়,' বার্টের দিকে ফিরে বলল জিম। 'কিন্তু তাতে সময় লাগবে। তাছাড়া দরকার কি? বামনরা তো ঢুকতে পারবে এর ভেতরে।'

'হ্যাঁ, তা পারবে,' এক বামনকে ইশারা করল বার্ট।

একের পর এক বামন ঢুকে গেল ভল্টে। ওদের টর্চের আলোয় চারকোণা একটা ঘর দেখা গেল। দেয়ালের তাকে থরে থরে সাজানো রয়েছে কাগজের নোট, গহনার বাক্স। মেঝেতে ফেলে রাখা হয়েছে মুদ্রার বস্তা।

'দশ লাখ ডলারের বেশি!' নোটগুলোর দিকে চেয়ে আছে বার্ট, জ্বলছে চোখের তারা। 'সোমবার অ্যারোপ্লেন কোম্পানির বেতনের দিন। তাই হেড অফিস থেকে এত টাকা তুলে এনে রাখা হয়েছে।' কিশোরকে জানাল সে।

গভীর আগ্রহ নিয়ে বামনদের কাজ দেখছে কিশোর। তাক থেকে নোটের তাড়া নামিয়ে ছোট ছোট বস্তায় ভরল ওরা। অলঙ্কারের বাক্সগুলো ভরল আলাদা একটা বস্তায়।

'পয়সার বস্তা নিয়ো না,' বামনদেরকে বলল জিম। 'বেশি ভারি।'

'শুধু দুটো বস্তা নিয়ে এস,' হাত নাড়ল বার্ট। 'দরকার আছে।'

নোট আর গহনার বস্তা এপাশে পাচার করে দিল বামনরা। মুদ্রার ভারি বস্তা পার করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হল। ভল্ট থেকে বেরিয়ে এল ওরা।

জুড়িতে বস্তাগুলো সব তুলে ধরাধরি করে নিয়ে আসা হল সুড়ঙ্গের বাইরে, কয়লা রাখার ঘরে। একটা বস্তা খুলে নোটের বাণ্ডিল বের করল বার্ট। বামন সর্দারের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'এই নাও, এক লাখ। চারজনে ভাগ করে নিয়ো। সাবধানে খরচ কোরো, নইলে বিপদে পড়বে। যাও এখন। তোমাদের কাজ শেষ। আমরাও এখুনি যাব।'

'অত তাড়াহুড়ো নেই,' বলল রিক। 'অনেক আগেই কাজ শেষ করে ফেলেছি।'

রিকের কথার কোন জবাব না দিয়ে কিশোরের দিকে ঘুরল বার্ট। 'খোকা, আমাদের কাজ তো দেখলে, কি ঠিক করলে? আমাদের সঙ্গে থাকবে? আমি বলি থাক, কাজ কর, প্রচুর টাকা কামাই করতে পারবে। তোমার যা ব্রেন, খুব

গ্যাঙ-লীডার হতে পারবে একদিন।'

কি জবাব দেবে কিশোর?-ভাবল মুসা। কিশোর কি রাজি হবে?

'আরও ভাবতে হবে আমার,' বলল গোয়েন্দাপ্রধান। 'আসলে অর্ধেক কাজ শেষ হয়েছে তোমাদের, কঠিন কাজটাই বাকি রয়ে গেছে এখনও। অপরাধ করা সহজ, কিন্তু করে পার পাওয়া খুব কঠিন। বেশির ভাগ অপরাধীই সেটা পারে না।'

কিশোরের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ল বার্টের, হাসল। সঙ্গীদের দিকে ফিরে বলল, 'বলেছি না, ছেলেটার বুদ্ধি আছে।' কিশোরকে বলল, 'একটু কষ্ট করতে হবে তোমাদের। রিক...,' মাথা নেড়ে ইঙ্গিত করল সে।

বড় বড় দুটো চটের বস্তা নিয়ে এল রিক। কিশোর আর মুসাকে বস্তায় ভরে বস্তার মুখ বেঁধে ফেলা হল।

'ট্রাকে তুলে দাও,' বলল বার্ট।

'খামোকা ঝামেলা,' বলল রিক। 'ওরা আমাদের কথা শুনবে বলে মনে হয় না।'

'তাই মনে হচ্ছে না? পয়সার বস্তা দুটো কেন নিয়েছি? তেমন বুঝলে পায়ে বেঁধে পানিতে ফেলে দিলেই হবে,' শব্দ করে হাসল বার্ট।

চোদ্দ

রোববার সকাল।

জানালা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে ঘরে। ঘুম ভাঙল রবিনের, কিন্তু চুপচাপ বসে রইল অলস কয়েকটা মুহূর্ত। মুসা আর কিশোরের কথা মনে পড়তেই লাফ দিয়ে উঠে বসল। রাতে কতখানি কি করেছে ওরা? কিছু দেখেছে? রত্নদানো ধরতে পেরেছে? ফোন করেছে?

তাড়াতাড়ি কাপড় পরে নিল রবিন। ওয়াকি-টকিটা পকেটে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে লাফাতে লাফাতে নিচে নামল। রান্নাঘর থেকে গরম কেকের গন্ধ আসছে। ম্যাপল গুড়ের তাজা সুগন্ধ সুড়সুড়ি দিচ্ছে যেন নাকে।

'মা, কিশোর ফোন করেছে?' রান্নাঘরে ঢুকেই জিজ্ঞেস করল রবিন।

'না।'

তারমানে, রাতে তেমন কিছু ঘটেনি, ভাবল রবিন। তাড়াহুড়োর কিছু নেই। ধীরেসুস্থে নাস্তা সারল সে। তারপর সাইকেল বের করে নিয়ে রওনা হল স্যালভিজ ইয়ার্ডে।

খোলা সদর দরজা দিয়ে ইয়ার্ডের আঙিনায় ঢুকে পড়ল রবিন।

হাফ-ট্রাকটা ধোয়া-মোছায় ব্যস্ত বোরিস। তার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল রবিন, 'এলে অ...শারের কোন খবর আছে?'

'না,' মুখ না ফিরিয়েই জবাব দিল বোরিস।

ভাঁজ পড়ল রবিনের কপালে। ইয়ার্ডের অফিসে ঢুকল। মিস ভারনিয়ার বাড়িতে ফোন করল। রিঙ হচ্ছে, কিন্তু কেউ ধরছে না ওপাশ থেকে। কেন? আবার ডায়াল করল সে। এবারেও ধরল না কেউ। কি ব্যাপার? চিন্তিত হয়ে পড়ল সে। অফিস থেকে বেরিয়ে এল। 'বোরিস, কেউ রিসিভার তুলছে না! মনে হচ্ছে কেউ বাড়িতে নেই।'

ফিরে তাকাল বোরিস। 'রক্তদানোদের শিকার হয়ে গেল না তো?'

'জলদি চলুন! একটা কিছু ঘটেছে!'

'চল!'

ঠিক এই সময় বেজে উঠল টেলিফোন।

'নিশ্চয় কিশোর!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন। ছুটে এসে আবার ঢুকল অফিসে, প্রায় ছোঁ মেরে তুলে নিল রিসিভার। 'হ্যাল্লো! পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ড।'

'কিশোর স্যান আছে?' মিরোর গলা চিনতে পারল রবিন। বলল, 'না, বাইরে গেছে। আমি রবিন।'

'ও, রবিন স্যান। কিশোরের জন্যে একটা মেসেজ আছে। আবার তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়েছে মিউজিয়মে, ছবিগুলোর পেছনেও দেখা হয়েছে।'

'গোল্ডেন বেল্ট পাওয়া গেছে?' সিরিসভার জোরে কানে চেপে ধরল রবিন।

'নাহ্! বাবা খুব রেগে গেছে আমার ওপর। অযথা হয়রানি করা হয়েছে বলে। আমার কিন্তু এখনও পুরোমাত্রায় বিশ্বাস রয়েছে কিশোর-স্যানের ওপর। গোল্ডেন বেল্ট পাওয়া যায়নি, বল তাকে।'

'বলব,' রিসিভার নামিয়ে রাখল রবিন।

ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে রেখেছে বোরিস, রবিন এসে তার পাশে উঠে বসতেই গাড়ি ছেড়ে দিল।

ছবির পেছনে গোল্ডেন বেল্ট পাওয়া যায়নি! কিশোরের জন্যে একটা বড় দুঃসংবাদ, ভাবল রবিন। এমন তো সাধারণত করে না কিশোর! তাহলে?

একে রোববার, তার ওপর খুব সকাল, রাস্তায় গাড়ির ভিড় কম। সাংঘাতিক স্পীড দিয়েছে বোরিস, থরথর করে কাঁপছে ট্রাক। পয়তাল্লিশ মিনিটের মাথায় মিস ভারনিয়ার গেটে এসে পৌঁছুল ওরা।

ইঞ্জিন থামার আগেই দরজা খুলে লাফিয়ে ট্রাক থেকে নেমে পড়ল রবিন। ছুটে এসে বেলের বোতাম টিপে ধরল। ধরেই রাখল, কিন্তু কোন সাড়া এল না বাড়ির ভেতর থেকে। পুরোপুরি শঙ্কিত হয়ে উঠল সে। বোরিসকে ডাকল।

ট্রাক থেকে নামছে বোরিস, এই সময় রবিন লক্ষ্য করল মিস ভারনিয়ার বাড়ির গেট পুরোপুরি বন্ধ নয়। ঠেলে পাল্লা আরও ফাঁক করে ঢুকে পড়ল আঙিনায়। তার পেছনেই ঢুকল বোরিস। বারান্দায় এসে উঠল দু'জনে।

দরজার পাশে আরেকটা বেলের বোতাম, টিপে ধরল রবিন, কিন্তু এবারও সাড়া দিল না কেউ।

'নিশ্চয় পাথর বানিয়ে ফেলেছে দানোরা!' নিচু গলায় বলল বোরিস।

দরজায় ঠেলা দিল রবিন। হাঁ হয়ে খুলে গেল পাল্লা। বাইরে থেকে চেঁচিয়ে কিশোর আর মুসার নাম ধরে কয়েকবার ডাকল সে, জবাব এল না। ঘরের দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এল তার চিৎকার।

পুরো বাড়ি খুঁজে দেখল রবিন আর বোরিস, ভাঁড়ারও বাদ দিল না। কিন্তু কাউকেই পাওয়া গেল না। সিঁড়ির মাথার ঘরে কিশোরের ব্যাগ, মুসার পাজামা আর হাতব্যাগ পড়ে রয়েছে।

'নিশ্চয় কিছু দেখেছে মুসা আর কিশোর!' দ্রুত চিন্তা চলছে রবিনের মাথায়। 'হয়ত আরও কাছে থেকে দেখতে গিয়ে ধরা পড়েছে! দুজনের পিছে পিছে গিয়েছেন মিস ভারনিয়া, তিনিও ধরা পড়েছেন!'

'রত্নদানোরাই ধরেছে!' মুখ শুকিয়ে গেছে বোরিসের।

'বাইরে খুঁজে দেখি, চলুন!' গলা কাঁপছে রবিনের। তিনজন জলজ্যান্ত মানুষকে দানোরা পাথর বানিয়ে ফেলেছে, এটা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না সে। তার ধারণা, অন্য কিছু ঘটেছে। 'আঙিনা থেকে শুরু করব।'

কিশোরের ক্যামেরাটা খুঁজে পেল রবিন। ঝোপের একটা সরু ডালে বেল্ট পেঁচিয়ে আছে। হ্যাঁচকা টান মেরে ডাল থেকে বেল্ট ছাড়িয়ে দিল সে। 'এখান দিয়ে গেছে কিশোর! নিশ্চয় কোন কিছুর ফটো তুলেছে!'

ক্যামেরা থেকে ছবি বের করল রবিন। দেখার জন্যে ঝুঁকে এল বোরিস।

ছবি দেখে থ হয়ে গেল দু'জনেই। জানালায় দাঁড়িয়ে আছে ভয়ঙ্কর চেহারার রত্নদানো!

'কি···কি বলেছিলাম!' তোতলাতে শুরু করল বোরিস। 'ওদেরকে ধরে নিয়ে গেছে।'

'পুলিশকে খবর দিতে হবে···,' বলতে বলতে থেমে গেল রবিন। এই ছবি পুলিশকে দেখালে তাদের কি প্রতিক্রিয়া হবে, ভেবে, দ্বিধা করল। না, আগে সে আর বোরিস খুঁজে দেখবে। না পাওয়া গেলে তখন অন্য কথা। 'বোরিস, এ-বাড়িতে নেই ওরা। যাওয়ার সময় কোন সূত্র রেখে গেছে হয়ত। আরও ভালমত খুঁজতে হবে আমাদের। এখানে না পেলে পুরো ব্লকটা খুঁজে দেখব।'

আরও একবার খোঁজা হল মিস ভারনিয়ার বাড়ি। কিছু পাওয়া গেল না। বেরিয়ে পড়ল ওরা ও-বাড়ি থেকে।

আগে আগে পথে এসে নামল রবিন, তার পেছনে বোরিস। কাউকে দেখা গেল না রাস্তায়; একেবারে নির্জন। গলিপথ ধরে থিয়েটার-বাড়ির পেছনে চলে এল ওরা।

নীল চকটা রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখল রবিন। অর্ধেক ক্ষয় হয়ে গেছে, তারমানে কিছু লিখেছে মুসা। এখানে এল কি করে এটা? মুসা ইচ্ছে করে ফেলে রেখে গেল? নাকি কোনভাবে তার পকেট থেকে পড়ে গেছে।

তীক্ষ্ণ চোখে আশপাশটা পরীক্ষা করে দেখল রবিন। আর কোন রকম চিহ্ন নেই। বাড়ির দেয়াল দেখল, ধীরে ধীরে তার নজর উঠে যাচ্ছে উপর দিকে। হঠাৎ চোখে পড়ল চিহ্নটা। নীল চক দিয়ে মস্ত বড় করে আঁকা হয়েছে একটা প্রশ্নবোধক। কোন সন্দেহ নেই, মুসাই এঁকেছে! কিন্তু খাড়া দেয়াল, ওখানে উঠল কি করে সে? ভেবে কোন কূলকিনারা পেল না রবিন।

'বোরিস,' হাত তুলে প্রশ্নবোধক চিহ্নটা দেখাল রবিন। 'ওটা মুসা এঁকেছে! আমার মনে হয় এই বাড়ির ভেতরেই আছে ওরা!'

'দরজা ভাঙতে হবে!' বন্ধ পাল্লার দিকে চেয়ে বলল বোরিস। পা বাড়াল দরজার দিকে।

খপ করে বোরিসের হাত চেপে ধরল রবিন। 'না না, ভাঙতে গেলে শব্দ হবে। অনেক দরজা আছে, একটা না একটা খোলা পাওয়া যাবেই।'

মিস ভারনিয়ার বাড়ির পেছনের গলি পথটার কাছে বোরিসকে নিয়ে এল রবিন। ফিসফিস করে বলল, 'সাবধানে এগোতে হবে!'

পকেটে থেকে ছোট গোল একটা আয়না বের করল রবিন। কিশোরের ধারণা, তিন গোয়েন্দার কাজে লাগবে এই জিনিস, তাই তিনজনেই একটা করে সঙ্গে রাখে।

উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল রবিন। হামাগুড়ি দিয়ে এগোল। গলি পথটার মোড়ে এসে থামল, পাঁচ আঙুলে আয়নাটা ধরে হাত বাড়িয়ে দিল সামনে। আয়নার ভেতরে দেখা যাচ্ছে পথটা। ইমার্জেন্সী ডোরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটা সবুজ ভ্যান। আগেরদিন ওখানে ওটা ছিল না।

দরজা খুলে বেরিয়ে এল একজন মানুষ। তাকে দেখেই চমকে উঠল রবিন। বার্ট ইঅং, হাতে একটা বস্তা, ভেতরে ঠাসাঠাসি করে ভরা হয়েছে কিছু। বার বার এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে ইঅং, যেন ভয় করছে, কেউ তাকে দেখে ফেলবে।

'রবিন, কিছু দেখেছ মনে হচ্ছে?' পেছন থেকে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল বোরিস।

'নাইটগার্ড! নিশ্চয় কিছু চুরি করছে ব্যাটা! আর কোন সন্দেহ নেই, ভেতরেই আছে মুসা আর কিশোর।'

'তাহলে চল ঢুকে পড়ি! গার্ড ব্যাটা কিছু বললে...' শার্টের হাতা গোটাল বোরিস।

'না না, এভাবে যাওয়া ঠিক হবে না,' বাধা দিল রবিন। 'নিশ্চয় ভেতরে গার্ডের আরও সাঙ্গোপাঙ্গো রয়েছে।...হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই যে আরও দু'জন বেরোচ্ছে,

হাতে বস্তা! বোরিস, পুলিশ ডাকতে হবে! জলদি যান! আমি আছি এখানে!'

বোরিসের ধারণা, তিন চোরকে সে একাই সামলাতে পারবে। বলল, 'পুলিশ ডাকার কি দরকার? আমিই...'

'না, ঝুঁকি নেয়া উচিত না! শিগগির যান!'

আর দ্বিরুক্তি না করে উঠে চলে গেল বোরিস।

হাত মাটির সঙ্গে প্রায় মিশিয়ে রেখেছে রবিন, তাই তার হাত কিংবা আয়নাটা চোখে পড়ছে না তিন চোরের। একের পর এক বস্তা এনে গাড়িতে তুলছে ওরা।

সময় যাচ্ছে। অস্থির হয়ে উঠছে রবিন। এখনও আসছে না কেন বোরিস?

গাড়িতে বস্তা তোলা বোধহয় শেষ হয়েছে চোরদের। গাড়ির কাছেই দাঁড়িয়ে কি যেন পরামর্শ করল ওরা। একসঙ্গে তিনজনেই আবার গিয়ে ঢুকল বাড়ির ভেতরে। খানিক পরে বেরিয়ে এল, দু'জনের কাঁধে দুটো বড় বস্তা, ভেতরে ভারি কিছু রয়েছে।

হঠাৎ নড়ে উঠল যেন একটা বস্তার ভেতরে কিছু! চোখের ভুল? আরও ভাল করে তাকাল রবিন। না না, ঠিকই নড়ছে। বস্তা ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে যেন ভেতরের 'কিছু'টা! ভ্যানের ভেতরে অন্যান্য বস্তার ওপর নামিয়ে রাখা হল বড় বস্তাদুটো।

বোরিসের দেরি দেখে হতাশ হয়ে পড়ছে রবিন, ঘামছে দরদর করে। বুঝতে পারছে, দুটো বস্তার ভেতরে রয়েছে কিশোর আর মুসা। বোরিস থাকলে দু'জনে ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারত লোকগুলোর ওপর, মুক্ত করতে পারত দুই বন্ধুকে। একাই যাবে কিনা ভাবল রবিন, পরক্ষণেই নাকচ করে দিল চিন্তাটা। সে গিয়ে একা কিছুই করতে পারবে না, বরং ধরা পড়বে।

ভ্যানের পেছনের দরজা বন্ধ করে দিল এক চোর। তিনজনেই উঠে বসল সামনের সিটে। মুহূর্ত পরেই ইঞ্জিন স্টার্ট নিল, চলতে শুরু করল গাড়ি।

রবিনের চোখের সামনে দিয়ে বস্তায় ভরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কিশোর আর মুসাকে, অথচ কিছুই করতে পারছে না সে! রাগে দুঃখে মাথার চুল ছিঁড়তে বাকি রাখল সে।

পনেরো

বড় বেকায়দা অবস্থায় রয়েছে মুসা আর কিশোর। হাত-পা বাঁধা, বস্তার পাটের আঁশ সুড়সুড়ি দিচ্ছে নাকে মুখে। টাকা-পয়সার উঁচু নিচু বস্তার ওপর পড়ে আছে, তার ওপর অমসৃণ পথে গাড়ির প্রচণ্ড ঝাঁকুনি, ব্যথা হয়ে গেছে দু'জনের পিঠ।

টেনে হাতের বাঁধন খোলার ব্যর্থ চেষ্টা করল কিশোর।

সঙ্গীকে নড়তে দেখে মুসা বলল, 'কিশোর, আমাদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে

ওরা?'

'বোধহয় কোন জাহাজে,' ফিসফিস করে জবাব দিল কিশোর। 'সাগর পাড়ি দেয়ার কথা বলছিল, মনে আছে?'

'শেষে পানিতে ডুবেই মরণ ছিল কপালে!' বিষণ্ণ শোনাল মুসার কণ্ঠ। 'বার্ট কি বলল শুনলে না? পয়সার বস্তা পায়ে বেঁধে ছেড়ে দেবে।'

'শুনেছি,' বলল কিশোর। 'মুসা, হ্যারি হুডিনির নাম শুনেছ? ওই যে সেই বিখ্যাত ম্যাজিশিয়ান, হাত-পা বেঁধে ড্রামে ভরে পানিতে ফেলে দিলেও যিনি বেঁচে ফিরতেন?'

'তাঁর মত জাদুকর হলে মোটেই ভাবতাম না,' গোঁ গোঁ করে বলল মুসা। 'কিন্তু আমি হুডিনি নই, মুসা আমান। বড় জোর মিনিট খানেক কোনমতে টিকে থাকতে পারব পানির তলায়, তারপরই জারিজুরি খতম।'

মুসার কথার ধরনে হেসে উঠল এক বামন। বন্দিদের সঙ্গে ওরা চারজনও চলেছে ভ্যানের পেছনে বসে।

'যদি পানিতে না ফেলে?' যে বামনটা হেসেছে, সে বলল। 'যদি কোন আরব শেখের কাছে বেচে দেয়? শুনেছি, আরবের কোন কোন আমির নাকি এখনও গোলাম কিনে রাখে।'

ব্যাপারটা ভেবে দেখল মুসা। সিনেমায় দেখেছে, গোলামদের ওপর কি রকম অকথ্য অত্যাচার করে মনিবেরা। কোনটা বেছে নেবে? পানিতে ডুবে মৃত্যু? নাকি শেখের গোলাম হওয়া? দুটোর কোনটাই পছন্দ হল না তার।

ছেলেদের কাছ থেকে জবাব না পেয়ে চুপ করে গেল বামনটা।

ভ্যানের গতি কমতে শুরু করল, ঝাঁকুনিও কমে এল।

বার্টের গলা শোনা গেল, বামনদেরকে বলছে, 'বাস ধরে চলে যাবে হলিউডে। আবার বলছি, বুঝেশুনে টাকা খরচ কর। লোকের চোখে যাতে না পড়ে।'

'আর বলতে হবে না,' বলল বামন। 'টাকা এখন খরচই করব না আমরা।'

'আরেকটা কথা, মুখ বন্ধ রাখবে!'

'রাখব।'

থেমে দাঁড়াল ভ্যান। পেছনের দরজা খুলে নেমে গেল বামনরা। দড়াম করে আবার বন্ধ হয়ে গেল দরজা, আবার ছুটল গাড়ি। কোনরকম ঝাঁকুনি নেই আর এখন, নিশ্চয় মসৃণ হাইওয়েতে উঠে এসেছে। কয়েক মাইল দূরেই রয়েছে সাগর। সেখানে ডাকাতদের অপেক্ষায় রয়েছে কোন একটা জাহাজ, ভাবল কিশোর।

প্রায় গুঙিয়ে উঠল মুসা। 'কিশোর, এইবার আমাদের খেল খতম! ইস্‌স্‌, কেন যে এই গোয়েন্দাগিরির ব্যবসা শুরু করেছিলাম!'

'আমাদের মেধাকে কাজে লাগানর জন্যে,' শান্তকণ্ঠে জবাব দিল কিশোর।

'মেধা জমে বরফ হয়ে গেছে আমার!' ঝাঁঝাল গলায় বলল মুসা। 'রবিনটাও

যদি সময়মত আসত! চিহ্নটা দেখত!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সে, 'কিশোর, দোহাই তোমার, চুপ করে থেক না! কিছু অন্তত বল! বল, বাঁচার আশা আছে আমাদের!'

'নেই,' সত্যি কথাটাই বলল কিশোর। 'বার্ট খুব চালাক। কোনরকম ফাঁক রাখেনি।'

ভ্যানকে অনুসরণ করে চলেছে ট্রাক। রবিন উত্তেজিত, বোরিস গম্ভীর।

বোরিস যখন ফিরেছিল, সবুজ ভ্যানটা তখন মাত্র গলির মোড় পেরিয়ে গেছে। পুলিশ আনতে পারেনি সে, রাস্তায় পুলিশ ছিল না। রবিন একবার ভেবেছে, কোন পুলিশ স্টেশনে ফোন করবে। কিন্তু পরে ভেবেছে, আজ রোববার, দোকান পাট সব বন্ধ, টেলিফোন করবে কোথা থেকে? কাজেই তখন যা করা উচিত, ঠিক তাই করেছে, বোরিসকে নিয়ে ট্রাকে উঠে পড়েছে, পিছু নিয়েছে ভ্যানের।

রোববার সকালে গাড়ির ভিড় কম, পথ প্রায় নির্জন, গতি বাড়াতে কোন অসুবিধে নেই। তীব্র গতিতে ছুটেছে ভ্যান, ওটার সঙ্গে তাল রেখে চলা কঠিন হয়ে পড়েছে ইয়ার্ডের পুরানো ট্রাকের পক্ষে। বার বার পিছিয়ে পড়ছে।

'দেব নাকি বাড়ি লাগিয়ে!' আপনমনেই বলল বোরিস। 'কোন ভাবে আটকে দিতে পারলে...'

'...না না, এতবড় ঝুঁকি নেয়া যাবে না! ভ্যান উল্টে যায় যদি? যেভাবে যাচ্ছেন, যেতে থাকুন।'

চলতে চলতে এক সময় গতি কমে গেল ভ্যানের, থামল। পেছনের দরজা খুলে টপাটপ লাফিয়ে নামল চারটে 'ছেলে'। তাড়াহুড়ো করে চলে গেল বাস স্টপের দিকে।

'ধরব নাকি পিচ্চিগুলোকে!' ভুরু কুঁচকে গেছে বোরিসের। 'গোটা কয়েক চড়থাপ্পড় দিলেই গড়গড় করে বলে দেবে সব।'

'কি বলবে?' হাত তুলল রবিন। 'না, ভ্যানটা হারাব তাহলে!'

পেছনের দরজা বন্ধ হয়ে গেল, আবার চলতে শুরু করল ভ্যান। মোড় নিয়ে পুরানো রাস্তা ছেড়ে হাইওয়েতে উঠে গেল। এগিয়ে চলল নাক বরাবর পশ্চিমে, উপকূলের দিকে।

পেছনে ট্রাক নিয়ে আঠার মত লেগে রইল বোরিস। কিন্তু আর বেশিক্ষণ লেগে থাকা বোধহয় সম্ভব না। ভ্যানটা নতুন, ওটার সঙ্গে পাল্লা দিতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে পুরানো ট্রাক।

নড়েচড়ে বসল রবিন। পকেটে টান পড়তেই গায়ে শক্ত চাপ অনুভব করল সে, মনে পড়ল ওয়াকি-টকিটার কথা। তাই তো? যোগাযোগ করা যায়। তাড়াতাড়ি পকেট থেকে ছোট্ট রেডিওটা বের করল সে। একটা বোতাম টিপে

দিয়ে কানের কাছে ধরল যন্ত্রটা। এক মুহূর্ত বিচিত্র গুঞ্জন উঠল স্পীকারে, পরক্ষণেই তাকে অবাক করে দিয়ে ভেসে এল একজন মানুষের গলা। কেমন পরিচিত। জোরাল, স্পষ্ট কথাঃ 'হাল্লো, হারবার! হাল্লো হারবার! অপারেশন থিয়েটার কলিং! শুনতে পাচ্ছ? শুনতে পাচ্ছ?'

টানটান হয়ে গেছে রবিনের সমস্ত স্নায়ু, উৎকর্ণ হয়ে আছে সে। জবাব এল অতি মৃদু গলায়ঃ 'হালো অপারেশন থিয়েটার। হারবার বলছি। কাজ শেষ? কোন গোলমাল?'

'হাল্লো, হারবার!' আরে, বার্ট ইঅং-এর কণ্ঠ। 'শেষ। কোন গোলমাল হয়নি। তবে দু'জন যাত্রী নিয়ে আসছি সঙ্গে। ডকের কাছাকাছি পৌছে আবার কথা বলব। ওভার অ্যাণ্ড আউট।'

চুপ হয়ে গেল স্পীকার।

হঠাৎ বুম্‌ম্‌ করে কান ফাটানো শব্দ উঠল। নিজের অজান্তেই মাথা নিচু করে ফেলল রবিন। ভ্যান থেকে বোমা ছুঁড়ল না তো!

থরথর করে কেঁপে উঠল ট্রাক, নাক সোজা রাখতে পারছে না যেন কিছুতেই। স্টিয়ারিঙে চেপে বসেছে বোরিসের আঙুল, ফুলে উঠেছে হাতের শিরা। অনেক কষ্টে ট্রাকটাকে সাইডরোডে নামিয়ে আনল সে, থামিয়ে দিল।

হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছছে বোরিস। 'টায়ার ফেটে গেছে!'

ঢিল হয়ে গেল রবিনের স্নায়ু। হেলান দিয়ে বসল, দু'হাত ছড়িয়ে পড়ল দু'দিকে। শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সবুজ ভ্যানটার দিকে, দ্রুত ছোট হয়ে যাচ্ছে ওটা।

ষোলো

যত তাড়াতাড়ি পারল, টায়ার বদলে নিল বোরিস। কিন্তু তাতেও দশ মিনিটের বেশি লেগে গেল। ইতিমধ্যে নিশ্চয় কয়েক মাইল এগিয়ে গেছে ভ্যানটা।

অদ্ভুত এক শূন্যতা অনুভব করছে রবিন। কেন যেন তার মনে হল, কিশোর আর মুসাকে আর কোনদিন দেখতে পাবে না।

'রবিন, এখন কি করা?' ড্রাইভিং সিটে রবিনের পাশে উঠে বসেছে আবার বোরিস। 'পুলিশের কাছে যাব?'

'কি হবে? ভ্যানের লাইসেন্স নাম্বার নিতে ভুলে গেছি আমি,' একেবারে হতাশ হয়ে পড়েছে রবিন। 'পুলিশকে কি বলব?'

কি যেন ভাবল বোরিস। 'সোজা পথ। ভ্যানটা যেদিকে গেছে সেদিকেই যাই,' বলতে বলতেই ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে গিয়ার দিল সে। নির্জন হাইওয়ে ধরে ট্রাক ছোটাল আবার পশ্চিমে।

গ্লাভ কম্পার্টমেন্ট থেকে লস অ্যাঞ্জেলেসের একটা ম্যাপ বের করল রবিন। তাতে দেখল, কয়েক মাইল সামনে এক জায়গায় পথটা দু'ভাগ হয়ে গেছে। একটা শাখা চলে গেছে সুন্দর সৈকত শহর লং বীচ-এর দিকে। আরেকটা শাখা গেছে স্যান পেড্রোতে।

রেডিওতে একটা বন্দরের কথা বলা হয়েছে। লং বীচে বন্দর নেই, স্যান পেড্রোতে আছে। তারমানে ওদিকেই গেছে ভ্যানটা।

'বোরিস, স্যান পেড্রোর দিকে যেতে হবে,' বলল রবিন।

'হোকে,' একমনে গাড়ি চালাচ্ছে ব্যাভারিয়ান।

পুরানো ইঞ্জিনের শক্তি নিঙড়ে যত জোরে সম্ভব ছুটে চলেছে ট্রাক। মগজে ভাবনার ছুরি চালাচ্ছে রবিন, কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারছে না রত্নদানো খুঁজতে গিয়ে ডাকাতদের হাতে পড়ল কি করে মুসা আর রবিন! তাদেরকে বস্তায় ভরে নিয়ে যাচ্ছে কেন মুরিশ থিয়েটারের দারোয়ান বার্ট ইঅং! বেশিক্ষণ ভাবনা চিন্তার সময় পেল না সে, দুই রাস্তার মোড়ে পৌঁছে গেল ট্রাক।

স্যান পেড্রোর রাস্তায় গাড়ি নামিয়ে আনল বোরিস। গতি সামান্য শিথিল করতে হয়েছিল, আবার বাড়িয়ে দিল।

শিগগিরই স্যান পেড্রোর সীমানা দেখা গেল দূর থেকে। রাস্তার দু'পাশে বিস্তীর্ণ মাঠে কালো কালো অসংখ্য বিন্দু দেখা যাচ্ছে। কাছে এলে বোঝা গেল ওগুলো কি। ডেরিক। কুৎসিত দানবের মত দাঁড়িয়ে আছে বিশাল কালো যন্ত্রগুলো, মাটির তলা থেকে তেল তোলার জন্যে বসানো হয়েছে।

বন্দরে এসে ঢুকল ট্রাক। তেলমেশানো ঘোলা পানিতে গাদাগাদি করে ভাসছে ছোট-বড় মাঝারি অগুনতি জলযান। নানারকম জাহাজের মাঝে মাঝে রয়েছে মাছ ধরার নৌকা আর লঞ্চ। প্রায় প্রতি মুহূর্তে বন্দরে ঢুকছে কিংবা বন্দর ত্যাগ করছে একের পর এক বোট, জাহাজ, ফ্রেইটার।

ট্রাক থামাল বোরিস। কোন্‌দিকে যাবে এবার? কোথাও দেখা যাচ্ছে না সবুজ ভ্যানটা। হাজারো জলযানের যে-কোনটাতে থাকতে পারে মুসা আর কিশোর। কোন্‌টাতে নিয়ে গিয়ে তোলা হয়েছে ওদেরকে, কি করে বোঝা যাবে?

'রবিন, কিছু ভাবতে পারছি না আমি!' তিক্ত কণ্ঠে বলল বোরিস। 'আর কোন আশা নেই!'

'কি জানি!' কপালে আঙুল ঘষছে রবিন। 'রেডিওতে বলল...,' হঠাৎ এমনভাবে লাফিয়ে উঠল সে, যেন বোলতা হুল ফুটিয়েছে। চাঁদিতে কেবিনের ছাতের বাড়ি লাগতেই ধুপ্‌ করে বসে পড়ল আবার। চেঁচিয়ে উঠল, 'রেডিও! হ্যাঁ, রেডিও! বন্দরে ঢুকে আবার কথা বলবে বলেছিল!' পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে সে।

বেশি তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে কয়েক সেকেণ্ড দেরি করে ফেলল রবিন।

পকেটের এখানে ওখানে বেধে গেল ওয়াকি-টকি, কিন্তু হাতে বেরিয়ে এল অবশেষে।

বোতাম টিপে ওয়াকি-টকি অন করে দিল রবিন, কানের কাছে নিয়ে এল যন্ত্রটা। দুরু দুরু বুকে অপেক্ষা করতে লাগল সে। কথা বলবে তো? নাকি এতক্ষণে বলে ফেলেছে?

রবিনকে চমকে দিয়ে হঠাৎ জ্যান্ত হয়ে উঠল স্পীকারঃ 'অপারেশন থিয়েটার! বোট নামিয়ে দিয়েছি। সাঁইত্রিশ নাম্বারে থাক, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তুলে নেব। মালপত্রসহ যাত্রীদেরকে তৈরি রাখ। সঙ্গে সঙ্গেই যাতে বোটে তুলে নেয়া যায়।'

'অপারেশন থিয়েটার বলছি,' বার্টের গলা শোনা গেল স্পীকারে। 'বোটটা দেখতে পাচ্ছি। যাত্রী আর মালপত্র ট্রাকে তৈরিই আছে। তুলতে দেরি হবে না।'

'গুড। আমরা আরও কাছে এলে একটা সাদা রুমাল নাড়বে, তাহলে বুঝব কোন গোলমাল নেই। ওভার অ্যাণ্ড আউট।'

চুপ হয়ে গেল স্পীকার। রবিন চেঁচিয়ে উঠল, 'বোরিস, জলদি, সাঁইত্রিশ নাম্বার জেটি! মাত্র পাঁচ মিনিট সময় আছে হাতে!'

'কিন্তু সাঁইত্রিশ নাম্বার কোন্‌টা? স্যান পেড্রোতে আসিনি আগে কখনও,' এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে বোরিস।

'কাউকে জিজ্ঞেস করতে হবে। জলদি!'

ধীরে এগোল ট্রাক। একটা লোকও চোখে পড়ছে না। রোববারের এই সকালে নির্জন হয়ে আছে এলাকাটা, মৃত বন্দর যেন। সামনে একটা বাঁক। মোড় নিয়েই পুলিশের গাড়িটা দেখতে পেল ওরা।

'ওই গাড়িটার পাশে, জলদি!' আঙুল তুলে দেখাল রবিন।

জোরে ছুটে এসে পুলিশের গাড়ির পাশে ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল বোরিস।

জানালা দিয়ে মুখ বের করে চেঁচিয়ে বলল রবিন, 'এই যে, স্যার, সাঁইত্রিশ নাম্বার জেটিটা কোথায়, বলবেন?'

'সাঁইত্রিশ?' বুড়ো আঙুল দিয়ে পেছন দিকে দেখাল অফিসার, রবিনরা যেদিক থেকে এসেছে সেদিক। 'তিনটে ব্লক পেছনে। না না, গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না, এটা ওয়ান ওয়ে। সামনে চার ব্লক যেতে হবে সোজা, ডানে মোড় নিয়ে...'

অফিসারের কথা শেষ হওয়ার আগেই এক কাণ্ড করল বোরিস। গ্যাস প্যাডালে পায়ের চাপ বাড়িয়ে বনবন করে স্টিয়ারিং ঘোরাল। প্রচণ্ড গর্জন করে উঠল ইঞ্জিন, দুই চাকার ওপর ভর দিয়ে আধ চক্কর ঘুরে গেল গাড়ি, টায়ার ঘষা খাওয়ার তীক্ষ্ণ কর্কশ আওয়াজ উঠল, পরক্ষণেই খেপা ঘোড়ার মত লাফ দিয়ে আগে বাড়ল ট্রাকটা। তীব্র গতিতে ছুটে চলল যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে।

'হেইই! বেআইনী...'চেঁচিয়ে উঠল অফিসার, মাত্র দুটো শব্দ রবিনের কানে

ঢুকল, বাকিটা ঢাকা পড়ে গেল ইঞ্জিনের শব্দে।

দেখতে দেখতে তিনটে ব্লক পেরিয়ে এল ট্রাক।

'মোড় নিন! মোড় নিন!' আঙুল তুলে দেখাল রবিন। পথের মোড়ে খাটো একটা সাইনবোর্ড, তাতে '৩৭' নাম্বার লেখা, তলায় তীর চিহ্ন দিয়ে দেখানো হয়েছে কোন্‌দিকে যেতে হবে।

আবার টায়ারের কর্কশ আর্তনাদ তুলে মোড় নিল ট্রাক। সামনে জেটিতে ঢোকার গেট। ভারি লোহার পাতের ফ্রেমে মোটা তারের জাল লাগিয়ে তৈরি হয়েছে পাল্লা।

সবুজ ভ্যানটা পানির প্রায় ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। সামনের বাম্পারের ঠিক পেছনে গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে সাদা রুমাল নাড়ছে একজন লোক। জেটি থেকে মাত্র শ'খানেক গজ দূরে একটা লঞ্চ, দ্রুত এগিয়ে আসছে এদিকেই।

'দরজায় তালা!' ট্রাকের গতি কমাল বোরিস।

পেছনে সাইরেনের শব্দ। ট্রাকের পাশ দিয়ে শাঁ করে বেরিয়ে কয়েক গজ সামনে গিয়েই দাঁড়িয়ে পড়ল পুলিশের গাড়িটা। ঝটকা দিয়ে খুলে গেল এক পাশের দরজা। রিভলভার হাতে লাফিয়ে নেমে এল পুলিশ অফিসার। ছুটে এল ট্রাকের দিকে।

ট্রাক থামিয়ে দিয়েছে বোরিস। তার পাশে এসে হাত বাড়াল অফিসার, 'ইউ আর আণ্ডার অ্যারেস্ট! ওয়ান ওয়েতে ইউ টার্ন নিয়েছ, বেআইনীভাবে গতি বাড়িয়েছ। দেখি, লাইসেন্স দেখি?'

'সময় নেই, অফিসার, আপনি বুঝতে পারছেন না!' চেঁচিয়ে বলল বোরিস। 'জলদি সাঁইত্রিশ নাম্বারে ঢুকতে হবে...'

'...লোডিং আজ বন্ধ,' বোরিসকে থামিয়ে দিয়ে বলল অফিসার। 'ধানাই পানাই বাদ দাও। লাইসেন্স দেখি।'

বোরিসের কাঁধের ওপর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দিল রবিন। 'অফিসার, সত্যিই বুঝতে পারছেন না আপনি! ওই ভ্যানে দুটো ছেলেকে কিডন্যাপ করা হয়েছে! প্লীজ, সাহায্য করুন আমাদেরকে!'

'ওসব কিচ্ছা-কাহিনী বাদ দাও, খোকা,' সবুজ ভ্যানটার দিকে একবার চেয়েই মুখ ফিরিয়ে নিল অফিসার। 'ওসব অনেক শোনা আছে,' বোরিসের দিকে চেয়ে বলে উঠল, 'কই, লাইসেন্স কই?'

প্রতিটি সেকেণ্ড এখন মূল্যবান, দ্রুত এগিয়ে আসছে লঞ্চ, কিন্তু অফিসারকে বোঝানো যাচ্ছে না সেটা। মরিয়া হয়ে চেঁচিয়ে উঠল রবিন, 'বোরিস, গেট ভেঙে ঢুকে যান! যা হয় হবে!'

এমন কিছুই একটা বোধহয় ভাবছিল বোরিস, রবিনের কথা শেষ হওয়ার আগেই সামনে লাফ দিল ট্রাক। পেছনে চেঁচিয়ে উঠল অফিসার, কানেই তুলল না

ব্যাভারিয়ান।

ভয়ঙ্কর গতিতে এসে গেটের পাল্লায় সামনের বাম্পার দিয়ে আঘাত হানল ট্রাক। তীক্ষ্ণ বিচিত্র শব্দ তুলে প্রতিবাদ জানাল যেন পাল্লা, পরক্ষণেই বাঁকাচোরা হয়ে ছিঁড়ে ভেঙে খুলে এল কব্জা থেকে. ট্রাকের বাম্পারে আটকে থেকে কয়েক গজ এগোল, তারপর খসে পড়ল পথের ওপর। পাল্লা মাড়িয়েই এগোনর চেষ্টা করল ট্রাক, কিন্তু পারল না। তারের জাল আর বাঁকাচোরা ইস্পাতের পাত জড়িয়ে ফেলল সামনের দুই চাকা। কান-ফাটা শব্দ করে ফেঁসে গেল একটা টায়ার। এখনও সবুজ ভ্যানটা রয়েছে পঞ্চাশ ফুট দূরে।

'রবিন, এস!' বলতে বলতেই এক ঝটকায় কেবিনের দরজা খুলে লাফিয়ে পথে নামল বোরিস। ছুটল।

দড়ি ছেঁড়া পাগলা ষাঁড়ের মত এসে বার্টের ঘাড়ে পড়ল বিশালদেহী ব্যাভারিয়ান। চমকে উঠে পকেটে হাত দিতে গেল ডাকাতটা, বোধহয় পিস্তল বের করার জন্যে, কিন্তু পারল না। তার আগেই দু'হাতে ধরে তাকে মাথার ওপর তুলে পানিতে ছুঁড়ে ফেলে দিল বোরিস।

দ্রুত সামলে নিল বার্ট। গতিক সুবিধের নয় বুঝে গেছে, সোজা লঞ্চের দিকে সাঁতরাতে শুরু করল সে।

ভ্যান থেকে বেরিয়ে এল রিক আর জিম, একজনের হাতে একটা রেঞ্চ, আরেকজনের হাতে টায়ার খোলার লীভার। একই সঙ্গে আক্রমণ চালাল বোরিসের ওপর।

ঝট করে বসে দু'জনের আঘাত প্রতিহত করল বোরিস, আবার সোজা হয়ে উঠে খপ করে ধরে ফেলল দুই ডাকাতের অস্ত্র ধরা দুই হাত, প্রায় একই সঙ্গে।

কব্জিতে প্রচণ্ড মোচর খেয়ে চেঁচিয়ে উঠল রিক আর জিম। হাত থেকে খসে পড়ল অস্ত্র। ঘাড় ধরে জোরে দু'জনের মাথা ঠুকে দিল বোরিস। তারপর ঠেলে নিয়ে গিয়ে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল পানিতে।

রবিন বসে নেই। ভ্যানের পেছনের খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকল, 'মুসাআ! কিশোরও!'

'রবিন!' বস্তার ভেতর থেকে শোনা গেল কিশোরের ভোঁতা কণ্ঠ। 'জলদি বের কর আমাদেরকে!'

'রবিন! জলদি, আর পারছি না! ওফ, বাবারে!' প্রায় কেঁদে ফেলল মুসা। কি ভাবে যেন গড়িয়ে এসে তার পেটের ওপরে পড়েছে কিশোর।

ওদিকে, জিম আর রিকও বার্টের পিছু নিয়েছে। তিনজনকেই তুলে নিয়ে নাক ঘোড়াল লঞ্চ। দ্রুত ছুটল কয়েকশো গজ দূরের বড় একটা মাছধরা জাহাজের দিকে।

পুলিশও পৌঁছে গেছে। বোরিসের ক্ষমতা দেখেছে ওরা, কাজেই সাবধানে

এগোচ্ছে। হাতে রিভলভার।

বোরিসের হাতের নাগালের বাইরে দাঁড়িয়ে রিভলভার নাচাল অফিসার। 'ইউ আর আণ্ডার অ্যারেস্ট! খবরদার, নড়বে না! গুলি খাবে!'

'আরে, আমাকে পরে ধরতে পারবেন!' লণ্ডটার দিকে আঙুল তুলে চেঁচিয়ে বলল বোরিস, 'ওদেরকে ধরুন! পালাচ্ছে তো!'

ইতিমধ্যে কিশোর আর মুসার বস্তার বাঁধন কেটে দিয়েছে রবিন। দ্রুতহাতে বাঁধন কেটে মুক্ত করে দিল কিশোরকে। দু'জনে মিলে মুক্ত করল মুসাকে।

ছেলেদেরকে দেখে চোখ বড় বড় হয়ে গেছে অফিসারের। 'আরে, কি কাণ্ড! তোমরা বস্তার ভেতরে কি করছিলে?'

রবিনের হাত থেকে ছুরিটা নিয়ে একটা ছোট বস্তার বাঁধন কেটে ফেলল কিশোর। ভেতরে হাত ঢুকিয়ে বের করল একমুঠো নোট। ছুঁড়ে দিল অফিসারের দিকে। 'এই হল কাণ্ড! ব্যাংক ডাকাতি!'

কিছুই বুঝতে পারল না যেন অফিসার। হাঁ করে চেয়ে আছে কিশোরের মুখের দিকে।

ভ্যান থেকে নামল কিশোর। অফিসারের সামনে এসে দাঁড়াল। 'জলদি করুন! নইলে পালিয়ে যাবে ডাকাতেরা! জলদি ধরুন ওদের!'

'ইয়ে, মানে তোমরা কারা!...মানে....' এখনও কিছু বুঝতে পারছে না অফিসার।

বুঝিয়ে বলতেই হল অফিসারকে। মূল্যবান অনেক সময় নষ্ট হল তাতে।

সতেরো

পাঁচ দিন পর, শনিবার। হেডকোয়ার্টারে বসে আলাপ আলোচনা করছে তিন গোয়েন্দা।

'ওই অফিসারটা একটা আহম্মক!' ঝাঁঝাল কণ্ঠে বলল মুসা। 'তাড়াতাড়ি করলে ধরতে পারত ব্যাটাদের, কিন্তু ওকে বোঝাতেই তো সময় গেল।'

'ইন্টারপোল দায়িত্ব নিয়েছে,' বলল কিশোর। 'ধরেও ফেলতে পারে।'

'কি জানি! তবে, রিকের সোনার দাঁত ভরসা। ওটাই চিনিয়ে দেবে ওকে। ধরা পড়লে ওই দাঁতের জন্যেই পড়বে।'

'আরে না-আ!' হাত নাড়ল রবিন। 'সোনার দাঁত অনেকেই বাঁধায় ওরকম। এই তো, সেদিন পিটারসন মিউজিয়মেও তো একজনের দেখলাম। একটা ছেলে...'

তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে রবিনের মুখের দিকে, যেন তাকে আর কখনও দেখেনি। 'পিটারসন মিউজিয়মে

সোনার দাঁত!' উত্তেজনায় রক্ত জমছে তার মুখে। 'রবিন! আগে বলনি কেন? কেন বলনি আগে?'

'একটা কাব স্কাউটের মুখে সোনার দাঁত, এতে অবাক হওয়ার কি আছে?' কিছুই বুঝতে পারছে না রবিন। 'বলারই বা কি আছে? ভুলেই গিয়েছিলাম...এখন কথা উঠল...'

'ইস্‌স্‌, আরও আগে যদি বলতে!' এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল কিশোর। আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, এই সময় বাইরে থেকে মেরিচাচীর ডাক শোনা গেল, 'কিশোর, আছিস ওখানে? মিরো এসেছে।'

মুসা গিয়ে মিরোকে নিয়ে এল।

অবাক চোখে হেডকোয়ার্টারের জিনিসপত্র দেখল মিরো। তারপর একটা চেয়ারে বসতে বসতে বলল, 'কিশোর স্যান, তোমাদেরকে বিদায় জানাতে এলাম। আগামীকালই জাপানে ফিরে যাচ্ছি আমরা।'

'এত তাড়াতাড়ি?' টেবিলে দুই কনুই রেখে সামনে ঝুঁকল কিশোর। 'প্রদর্শনী শেষ?'

'না, প্রদর্শনী চলবে,' বিষণ্ন ভাবে মাথা নাড়ল মিরো। 'শুধু বাবা আর আমি ফিরে যাচ্ছি। বাবাকে বরখাস্ত করেছে কোম্পানি। আর একদিন মাত্র চাকরি আছে তার।'

আন্তরিক দুঃখিত হল তিন গোয়েন্দা।

কি যেন ভাবল কিশোর। তারপর বলল, 'মিরো, পিটারসন মিউজিয়মে আর মাত্র একদিন প্রদর্শনী চলবে, না?'

'হ্যাঁ। আগামীকাল চলে বন্ধ হয়ে যাবে। অন্য শহরে চলে যাবে।'

'কাগজে পড়লাম, কালও চিলড্রেনস ডে।'

'হ্যাঁ। আগেরবার গণ্ডগোলের জন্যে ঠিকমত দেখতে পারেনি ছোটরা, তাই আরেক দিনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

'তারমানে সময় বেশি নেই হাতে। মিরো, তোমার বাবা শেষমেষ একবার সাহায্য করবেন আমাকে? বলে দেখবে?'

'সাহায্য?' ভুরু কোঁচকাল মিরো।

'আমার কথামত কাজ করবেন?'

'হয়ত করবে! গোল্ডেন বেল্ট ফিরে পেলে এখনও সম্মান রক্ষা হয়, চাকরি থাকে বাবার। বলে হয়ত রাজি করাতে পারব তাকে।'

'তাহলে চল যাই,' উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'গাড়ি নিয়ে এসেছ?'

'কোম্পানির গাড়ি।'

'গুড। রবিন, মুসা, তোমরা থাক। রবিন, রত্নদানোর কেসটা লিখে ফাইল করে ফেল, মিস্টার ক্রিস্টোফারকে দেখাতে হবে। মুসা, ছাপার মেশিনের একটা

রোলার ঠিকমত ঘুরছে না, দেখবে ওটা? আমি আসছি। কাল নাগাদ গোল্ডেন বেল্ট রহস্যের কিনারা হয়ে যাবে।'

হাঁ হয়ে গেছে মুসা আর রবিন। তাদেরকে ওই অবস্থায় রেখেই মিরোকে নিয়ে দুই সুড়ঙ্গে নেমে পড়ল কিশোর।

সামলে নিতে পুরো এক মিনিট সময় লাগল রবিন আর মুসার।

'রবিন,' অবশেষে বলল মুসা। 'কি করে কিনারা হবে?'

'জানি না!' দুই হাত নাড়ল রবিন, মাথা নাড়ল এদিক-ওদিক। কাগজ-কলম টেনে নিল।

খানিকক্ষণ গুম হয়ে বসে থেকে শেষে চেয়ার ঠেলে উঠে পড়ল মুসা। অযথা ভেবে লাভ নেই। তারচেয়ে মেশিনটা সেরে ফেললে একটা কাজ হয়ে যায়।

শেষ বিকেলে রহস্য আরও জমাট হল। কিশোরের কাছ থেকে ফোন এল হেডকোয়ার্টারে। দুই সহকারীর জন্যে নির্দেশঃ হেডকোয়ার্টারে ঢোকার সব ক'টা পথ ভাল মত পরীক্ষা করে দেখ। 'জরুরি এক' আর 'গোপন চার'-এ যেন কোন গোলমাল না থাকে। বার বার বেরিয়ে দেখ, কোনরকম অসুবিধে হয় কিনা। 'সবুজ ফটক এক', 'দুই সুড়ঙ্গ', 'সহজ তিন' আর 'লাল কুকুর চার' দিয়েও বেরোও বার বার। দেখ, ছয়টার মধ্যে কোন্ পথটা দিয়ে সবচেয়ে সহজে, সবচেয়ে কম সময়ে ঢোকা যায়।

মুসা কিংবা রবিন কোন প্রশ্ন করার আগেই লাইন কেটে গেল ওপাশ থেকে।

রবিনের নোট লেখা শেষ, মুসারও মেশিন সারানো হয়ে গেছে। কেন গোপন পথগুলো দিয়ে ঢুকতে-বেরোতে বলেছে কিশোর, কিছুই বুঝতে পারল না ওরা। তবু দেরি না করে কাজে লেগে গেল। কিশোর যখন করতে বলেছে, নিশ্চয় কোন না কোন কারণ আছে।

গোপনপথগুলো দিয়ে বার বার ঢুকল বেরোল দুই সহকারী গোয়েন্দা। দু'জনেই একমত হল, সবচেয়ে সহজে সবচেয়ে কম সময়ে ঢোকা কিংবা বেরোনো যায় 'সহজ তিন' দিয়ে।

আঠারো

রাতের খাবারের সময় হল, কিশোরের দেখা নেই। আরও এক ঘন্টা দেরি করে ফিরল সে, উত্তেজিত কিন্তু হাসি হাসি চেহারা। রবিন আর মুসা দেখে অবাক হল, সুকিমিচি কোম্পানির গাড়িতে করে নয়, ট্যাক্সি নিয়ে এসেছে গোয়েন্দাপ্রধান। গাড়ি থেকে মিরোকে চুপিচুপি নামতে দেখে আরও অবাক হল দুই সহকারী গোয়েন্দা।

মিরোকে নিয়ে বাড়ির পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকল কিশোর, কেউ দেখে ফেলবে এই ভয় যেন করছে।

'এই যে, এসেছ!' বলে উঠলেন মেরিচাচী। 'কিশোর, এত দেরি করলি কেনরে? আমরা এদিকে ভেবে মরি। দেখ, চেহারার কি ছিরি করে এসেছে! আরে, এই কিশোর, জ্যাকেটের বোতাম লাগাতেও তোর কষ্ট হয় নাকি? কোমরের কাছে লাগাস না কেন? বিচ্ছিরিভাবে ঝুলে আছে।'

মিরোকে একটা চেয়ার দেখিয়ে নিজে আরেকটাতে বসে বলল কিশোর, 'আস্তে, চাচী, আস্তে। একসঙ্গে এতগুলো প্রশ্ন করলে কোন্‌টার জবাব দেব?'

'এই যে, বসে পড়লি তো? কোথায় কোথায় ঘুরে এসেছে কে জানে! হাতে-মুখে ময়লা···যা, জলদি ধুয়ে আয় ভাল করে।'

মিরোকে নিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে এল কিশোর।

খেতে খেতে মুখ তুললেন রাশেদ চাচা। 'কিশোর, আবার কিসে জড়িয়েছ? তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, আর কখনও ডাকাতদের সঙ্গে মিশবে না। বস্তায় ভরে একবার তো দিয়েছিল সাগরে ফেলে। ভাগ্যিস রবিন গিয়েছিল···খবরদার, ডাকাতির কেস আর কখনও নেবে না।'

'গেছিলাম তো রত্নদানো ধরতে, ডাকাতের পাল্লায় পড়ব তা কি আর জানি?' বসতে অসুবিধে হচ্ছে যেন কিশোরের। খালি নড়ছে, একবার এভাবে বসছে, একবার ওভাবে।

'হুঁমম!' জবাব খুঁজে পাচ্ছেন না রাশেদ চাচা। ভাজা গরুর মাংসে ছুরি চালালেন, কাঁটা চামচ দিয়ে এক টুকরো মুখে ফেলে চিবাতে চিবাতে বললেন, 'তা এখন আবার কি ধরে এলে? জিন, না পরী?'

'মিরোকে সাহায্য করতে গিয়েছিলাম,' জাপানী কিশোরের কাঁধে হাত রাখল গোয়েন্দাপ্রধান। 'বড় বিপদে পড়েছেন ওর বাবা। একটা বেল্ট চুরি হয়েছে, ওটার খুঁজে বের করতে গিয়েছিলাম।'

'গোল্ডেন বেল্টের কথা বলছ?' চিবানো থেমে গেছে রাশেদ চাচার। 'পারবে বের করতে? আমি অনেক ভেবেছি, কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারিনি কোন্ দিক দিয়ে কিভাবে ওটা বের করে নিয়ে গেল চোরেরা।'

মাথা ঝাঁকাল শুধু কিশোর, কি বোঝাতে চাইল সে-ই জানে।

এরপর আর বেশি কথাবার্তা হল না। খাওয়া শেষ হল।

অনেক প্রশ্ন ভিড় করে আছে রবিনের মনে, কিন্তু কিশোরকে জিজ্ঞেস করার সুযোগই পেল না। কেমন যেন ঝিম মেরে বসে আছে গোয়েন্দাপ্রধান। আরেকটা ব্যাপার, এই গরমের বিকেলে জ্যাকেট পরে আছে কেন সে? মেরিচাচী বলায় কোমরের কাছের বোতাম লাগিয়েছে, টান টান হয়ে আছে জায়গাটা। হঠাৎ কি করে এত চর্বি জমে গেল তার পেটে!

অন্ধকার নামতে শুরু করতেই উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'রবিন, মুসা, চল . হেডকোয়ার্টারে যাই।'

ম্যাগাজিন পড়ছেন রাশেদচাচা, ডিশ-প্লেট ধুচ্ছেন চাচী। চুপচাপ বেরিয়ে এল ছেলেরা।

হেডকোয়ার্টারে ঢুকেই দুই সহকারীকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'যা বলেছিলাম . করেছ?'

মাথা ঝাঁকাল মুসা আর রবিন।

'করা উচিত হয়নি,' বলল মুসা। 'রাস্তার ওপাশে কয়েকটা ছেলে ঘুড়ি ওড়াচ্ছিল, আমাদেরকে দেখেছে। গোপন পথগুলো দেখে ফেলেছে ওরা।'

'আমাদের ওপর চোখ রাখার জন্যে গুঁটকিই হয়ত পাঠিয়েছে,' রবিন বলল। 'আমারও মনে হয় কাজটা উচিত হয়নি, তুমি বললে বলেই করলাম।'

'ঠিকই করেছ,' সন্তুষ্ট মনে হল কিশোরকে। 'আমারও সময় খুব ভালই কেটেছে, পরে বলব সব। এস, এখন আমাদের কোন একটা অভিযানের কথা শোনাও মিরোকে। ও শুনতে চায়।'

আগ্রহী শ্রোতা পাওয়া গেছে, খুশি হয়েই গল্প শুরু করল রবিন।

বাইরে অন্ধকার গাঢ় থেকে গাঢ়তর হচ্ছে। মাথার ওপরের স্কাইলাইটের ঢাকনা হাঁ করে খুলে দিয়েছে কিশোর, তারাজ্বলা কালো আকাশ চোখে পড়ছে।

ফিসফিস-করে-কথাবলা-মমির গল্প সবে মাঝামাঝি এসেছে, এই সময় নড়েচড়ে উঠল কিশোর। এক এক করে বোতাম খুলল, গা থেকে খুলে ফেলল জ্যাকেট। শার্টের নিচের দিকটা তুলে দেখাল দুই সহকারীকে।

'প্রফেসর' বলতে যাচ্ছিল রবিন, কিন্তু 'প্রফে' বলেই থেমে গেল। অস্ফুট একটা শব্দ করে উঠল মুসা। দু'জনেরই চোখ বড় বড় হয়ে গেছে।

কিশোরের কোমরে সম্রাটের সোনার বেল্ট!

বড় বড় চারকোনা সোনার টুকরো, তাতে উজ্জ্বল পাথর বসানো। না, কোন ভুল নেই, গোল্ডেন বেল্টই পরে আছে গোয়েন্দাপ্রধান।

'ভীষণ ভারি!' নড়েচড়ে বসল কিশোর। 'প'রে রাখতে খুব কষ্ট হচ্ছে।' কোমর থেকে বেল্ট খুলে টেবিলে রাখল সে।

মুখে খই ফুটল দুই সহকারীর। নানা প্রশ্ন। বেল্টটা কোথায় পেয়েছে কিশোর? পরে রয়েছে কেন? কেন কর্তৃপক্ষকে ফেরত দেয়নি? কেন...

হঠাৎ ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দুই সুড়ঙ্গের ঢাকনা। খুদে কুৎসিত একটা মানুষের মুখ দেখা দিল। পরক্ষণেই ভেতরে উঠে এল মানুষটা। হাতে ইয়াবড় এক ছুরি। জ্বলন্ত চোখে ছেলেদের দিকে চেয়ে ভয়াবহ ভঙ্গিতে ছুরি নাচাল সে। ঠিক সেই মুহূর্তে খুলে গেল 'লাল কুকুর চার'-এর-দরজা। ছুরি হাতে ঢুকল আরেকজন খুদে মানুষ। খুলে গেল 'সহজ তিন', দেখা গেল আরেকটা মুখ, সেটার পেছনে

আরেকটা।

'বিচ্ছুরা,' তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠল এক আগন্তুক, 'এবার ভালয় ভালয় বেল্টটা দিয়ে দাও তো!'

পায়ে পায়ে চারপাশ থেকে এগিয়ে আসতে শুরু করল চার বামন।

বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন কিশোরের দেহে। ছোঁ মেরে বেল্টা তুলে নিয়েই লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল টেবিলে। স্কাইলাইটের ওপাশে আটকানো দড়ির সিঁড়ি টেনে নামাল। চেঁচিয়ে বলল, 'মিরো, জলদি!'

বানরের মত দাড়িয়ে সিঁড়ি বেয়ে ট্রেলারের ছাতে উঠে গেল মিরো। বেল্টটা তার হাতে দিয়ে মুসা আর রবিনের দিকে তাকাল কিশোর। 'তোমরাও ওঠ!'

বিনা প্রতিবাদে ছাতে উঠে গেল দুই সহকারী গোয়েন্দা। তাদের ঠিক পর পরই উঠে পড়ল কিশোরও।

টেবিলে উঠে পড়ছে দুই বামন, একজন ইতিমধ্যেই সিঁড়ি ধরে ফেলেছে।

ট্রেলারের ছাতে আটকা পড়েছে চার কিশোর। কোনদিকে যাওয়ার পথ দেখা যাচ্ছে না। ওদিকে ছুরি হাতে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করেছে এক বামন।

কোন্ দিক দিয়ে কিভাবে সরে যাবে, আগেই ভেবে রেখেছে যেন কিশোর। ট্রেলারের গায়ে ঠেকিয়ে রাখা হয়েছে পুরানো একটা স্লিপার, বাচ্চাদের কোন পার্ক থেকে কিনে এনেছেন রাশেদ চাচা। লোহার কয়েকটা মোটা মোটা কড়ি আড়াআড়ি পরে আছে স্লিপারের ওপর।

একমুহূর্ত সময় নষ্ট করল না কিশোর। নিচের দিকে পা দিয়ে উপুড় হয়ে স্লিপারে শুয়ে পড়ল। শাঁ করে কড়ির তলা দিয়ে নেমে চলে এল কাঠের গুঁড়োয় ঢাকা মাটিতে। ডেকে সঙ্গীদেরকেও নামতে বলল। কিশোরের মতই একে একে নেমে এল মিরো, রবিন, মুসা। জঞ্জালের ভেতর দিয়ে পথ করা আছে, তাতে ঢুকে পড়ল চারজনে।

স্লিপারে আড়াআড়ি করে কড়ি রাখা আছে, এটা জানে না বামনেরা। অন্ধকারে ভাল দেখতেও পেল না। তাই শুয়ে না নেমে স্লিপারে বসে পড়ল এক বামন। শাঁ করে খানিকটা নেমেই থ্যাক্ করে বাড়ি খেল কড়িতে, আটকে গেল তার শরীরে, রাতের অন্ধকার চিরে দিল তার তীক্ষ্ণ চিৎকার।

'এদিক দিয়ে নয়!' চেঁচিয়ে সঙ্গীদেরকে বলল বামনটা। 'বেরিয়ে যাও! ঘুরে এসে ধর বিচ্ছুগুলোকে! ওরা বেরিয়ে যাচ্ছে!'

ছাতে হুড়োহুড়ির শব্দ হল। স্কাইলাইট দিয়ে টপাটপ আবার ট্রেলারের ভেতরে লাফিয়ে নামল বামনগুলো। সবচেয়ে সহজপথ 'সহজ তিন' দিয়ে বেরোবে।

'ওদের ধরতেই হবে!' চেঁচিয়ে বলল আবার কড়িতে আটকাপড়া বামনটা। নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আবার স্লিপার বেয়ে ছাতে উঠে যাওয়ার চেষ্টা করছে সে। 'বেল্টটা নিয়ে গেছে বিচ্ছুগুলো!'

অনেকগুলো কাঠের গুঁড়িতে ঘেরা ছোট্ট একটুখানি খোলা অন্ধকার জায়গায় গাদাগাদি করে বসেছে ছেলেরা।

তীক্ষ্ণ হুইসেল বেজে উঠল হঠাৎ। সে-রাতে দ্বিতীয়বার চমকাল রবিন আর মুসা। পুলিশের হুইসেল। মাথা তুলে দেখল, প্রায় আধডজন ছায়ামূর্তি ছুটে আসছে ইয়ার্ডের আঙিনা ধরে।

মিনিটখানেক হুটোপুটির শব্দ হল, পুলিশের উত্তেজিত কণ্ঠ আর বামনদের তীক্ষ্ণ চেঁচামেচি শোনা গেল। ইতিমধ্যে তিন সঙ্গীকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছে কিশোর।

চার বামনকেই ধরে ফেলেছে পুলিশ। পুলিশের সঙ্গে মিস্টার টোহা মুচামারুও রয়েছেন।

বন্দীদেরকে হাতকড়া পরিয়ে গাড়িতে তোলা হল।

বাবার কাছে এসে দাঁড়াল মেরো। 'দেখলে তো, বাবা, কিশোর স্যানের বুদ্ধি? তুমি তো পাত্তাই দিচ্ছিলে না, অথচ গোল্ডেন বেল্ট খুঁজে বের করল সে, অপরাধীদের ধরিয়েও দিল।'

'আয়্যাম সরি, কিশোর,' লজ্জিত কণ্ঠে বললেন মুচামারু। 'তোমাদেরকে...'

'আরে না না, কি যে বলেন, স্যার,' তাড়াতাড়ি বলল কিশোর।

'যা-ই বল, কিশোর, অসাধ্য সাধন করেছ তোমরা। পুলিশই হাল ছেড়ে দিয়েছিল...মিরোর কথা না শুনলে যে কি ভুল করতাম! এক ভুল তো করেছিলাম তোমাদেরকে মিউজিয়ম থেকে বের করে দিয়ে!'

'এই যে, বাবা, বেল্টটা নাও,' মুচামারুর হাতে গোল্ডেন বেল্ট তুলে দিল মিরো।

তিন গোয়েন্দাকে বার বার ধন্যবাদ জানিয়ে মিরোকে নিয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠলেন মিস্টার মুচামারু।

লস অ্যাঞ্জেলেস পুলিশের চীফ ইয়ান ফ্লেচার আরও কিছুক্ষণ দেরি করলেন, কিছু প্রশ্ন করলেন কিশোরকে। তারপর তিনিও গিয়ে গাড়িতে উঠলেন। চলে গেল পুলিশের গাড়ি।

'কিশোর!' এইবার ধরল মুসা। 'কি করে এসব ঘটল কিছুই তো বুঝতে পারছি না! ওই বামনগুলোই তো রক্তদানো সেজেছিল, না?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'ইবলিস একেকটা।'

'গোল্ডেন বেল্ট কি ওরাই চুরি করেছিল?'

'তো আর কারা? কাব স্কাউট সেজে ঢুকেছিল মিউজিয়মে। রবিন সোনার দাঁতটার কথা না বললে কিছুই বুঝতে পারতাম না। গোল্ডেন বেল্ট নিয়ে হাওয়া হয়ে যেত ব্যাটারা।'

উনিশ

অনেকদিন পর আবার মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফারের অফিসে ঢুকেছে তিন গোয়েন্দা। বিশাল টেবিলের ওপাশে বসে আছেন বিখ্যাত চিত্র-পরিচালক। আগের মতই রয়েছে ঘরের পরিবেশ, কোন কিছু বদলায়নি এতটুকু।

মোটাসোটা ফাইলটা পরিচালকের দিকে ঠেলে দিল রবিন।

ফাইলে ডুবে গেলেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। অনেকক্ষণ পর মুখ তুলে বললেন, 'চমৎকার! আবার কৃতিত্ব দেখালে তোমরা।'

লজ্জিত হাসি হাসল রবিন আর মুসা। কিশোরের মুখ লালচে হয়ে উঠল।

'বামনরাই তাহলে রত্নদানো সেজেছিল,' আপনমনেই বললেন পরিচালক। 'ওদের সঙ্গে ভাব করেছে বব, এটা জানার পর ভারনিয়ার চেহারা কেমন হয়েছিল দেখতে ইচ্ছে করছে।'

'প্রথমে রেগে গিয়েছিলেন,' বলল কিশোর। 'বব অবশ্য জানত না, তাকেও ফাঁকি দিয়েছে বন্ট। ব্যাংক ডাকাতির ব্যাপারটা জানলে বব রাজি হত না কিছুতেই। খুব লজ্জা পেয়েছে সে, হাতে-পায়ে ধরে মাপ চেয়েছে ফুফুর কাছে। মাপ করে দিয়েছেন মিস ভারনিয়া। তিনি ঠিক করেছেন, বাড়ি বেচে দিয়ে সাগরের পারে কোথাও একটা ছোট কটেজ কিনবেন। পুরানো বাড়িতে আর থাকবেন না।'

'ভালই করেছে,' মাথা দেলালেন পরিচালক। 'আচ্ছা, এবার কিছু প্রশ্নের জবাব দাও তো! নোটে লেখনি। গোল্ডেন বেল্ট চুরি করল কিভাবে? কোথায় লুকিয়ে রাখল? বামনরা কি করে জানল তোমার কাছে বেল্টটা আছে?'

লম্বা শ্বাস নিল কিশোর। 'পুরোপুরি অন্ধকারে ছিলাম প্রথমে। রবিন সোনার দাঁতটার কথা বলার পর বুঝলাম সব কিছু।'

'শুধু একটা সোনার দাঁত!' ভুরু সামান্য কুঁচকে গেছে মিস্টার ক্রিস্টোফারের। 'শার্লক হোমসও পারত কিনা সন্দেহ!'

'সহজ ব্যাপার তো, স্যার,' বলল কিশোর। 'ছোট ছেলেদের দাঁত একবার পড়লে দ্বিতীয়বার গজায়, বাঁধানো সোনার দাঁত লাগানর দরকার পড়ে না। তারমানে মিউজিয়মের "বাচ্চা ছেলেটা" আসলে বয়স্ক মানুষ। আর ওই আকারের বয়স্ক মানুষ একমাত্র বামনই হতে পারে।'

'ঠিকই অনুমান করেছিলে।'

'যখনই বুঝে গেলাম, বামনরা গিয়েছিল কাব স্কাউট সেজে, দুয়ে দুয়ে চার যোগ করে নিতে অসুবিধে হল না। হলিউডে ওদের বাস, সিনেমা টেলিভিশনে ওরা অভিনয় করে, দড়াবাজিতে ওস্তাদ, চুরিচামারিতেও পিছিয়ে নেই ওদের অনেকেই। পিটারসন মিউজিয়মে অলঙ্কারের প্রদর্শনী শুরু হল, চোরডাকাতের

ভিড় জমল শহরে। রক্ত-চুরির ফন্দি করল ইঅং। বামনদেরকে দলে টানল। সুন্দর প্ল্যান করেছে সে। এক মহিলা অপরাধীকে ডেন মাদার সাজিয়ে বামনদের কাব স্কাউটের পোশাক পরিয়ে পাঠানো হল মিউজিয়মে। টোড মার্চকে ভাড়া করা হল মিউজিয়মের ভেতরে বিশেষ একটা সময়ে সামান্য অভিনয় করার জন্যে। অভিনয় শুরু করল মার্চ, লোকের চোখ তার দিকে আকৃষ্ট হল, এই সুযোগে ব্যালকনির সিঁড়ির গোড়ায় চলে গেলেন চার বামন। বাইরে থেকে কানেকশন কেটে আলো নিবিয়ে দিল বার্ট, মেকানিক সেজে গিয়েছিল সে-ই। দ্রুত ব্যালকনিতে উঠে গেল চার বামন। ওদিকে অন্ধকার হলঘরে তখন নরক গুলজার শুরু হয়ে গেছে।'

'তারপর?' কিশোরের দিকে ঝুঁকে এসেছে মুসা।

'বামনরা সঙ্গে করে দড়ি নিয়েছিল,' বলল কিশোর। 'তিনজন দড়ি ধরে রইল ওপর থেকে, চতুর্থজন দড়ি ধরে নেমে এল বেল্টের বাক্সের ওপর। বাক্স ভেঙে বেল্টটা বের করে নিতে বেশিক্ষণ লাগল না। দড়ি ধরে টেনে আবার তাকে ব্যালকনিতে তুলে নিল তার সঙ্গীরা।'

'হুঁম্‌ম্‌!' আস্তে মাথা দোলালেন পরিচালক। 'ওরা দক্ষ দড়াবাজিকর, আমার ধারণা, কাজটা করতে তিরিশ সেকেণ্ডও লাগেনি। এখন বুঝতে পারছি, কেন নেকলেস চুরি না করে বেল্ট চুরি করেছে ওরা। নেকলেসের বাক্সের ওপর নামার কোন উপায় ছিল না।'

'হ্যাঁ,' বলল কিশোর। 'বেল্টটা বাক্স থেকে সরাল বটে, কিন্তু জানে এত ভারি একটা জিনিস তখন হল থেকে বের করে নিয়ে যেতে পারবে না। কাজেই লুকিয়ে ফেলল।'

'হলের ভেতরেই লুকিয়েছে? কিন্তু পুরো মিউজিয়ম তো তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়েছে, পাওয়া যায়নি বেল্ট।'

'আসল জায়গাতেই খোঁজেনি ওরা। খুব মাথা খাটিয়ে লুকানর জায়গা ঠিক করেছে বামনরা। বেল্ট লুকিয়ে ফেলল, পরে সুযোগমত একদিন এসে নিয়ে যাবে বলে। সেদিন রাতে যদি ব্যাটাদের না ধরা যেত, পরের দিনই চিলড্রেনস ডে-তে আবার কাব স্কাউট সেজে গিয়ে বেল্ট বের করে নিয়ে যেত ওরা, কোন একটা সুযোগ সৃষ্টি করে।'

'হুঁম্‌ম্‌!' মাথা দোলালেন পরিচালক।

'ব্যাংক ডাকাতি হয়ে গেল, বার্টকে ধরতে পারল না পুলিশ। চার বামনকেও ধরতে পারল না। বোর্ডিং হাউসে খোঁজখবর করতে গিয়েছিল পুলিশ, কিন্তু মুখে তালা এঁটেছিল বামনের গোষ্ঠী। অনেক ভেবে ঠিক করলাম, ফাঁদ পেতে ওদেরকে ধরতে হবে, এছাড়া আর কোন উপায় নেই।'

'অ, এই ব্যাপার!' মুখ গোমড়া করে ফেলেছে রবিন। 'আমাকে আর মুসাকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করেছিলে!'

'রাগ কোরো না, রবিন, এছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। পথগুলো বামনদেরকে দেখানর দরকার ছিল, নইলে ঢুকত কি করে ওরা?' পরিচালকের দিকে ফিরল কিশোর। 'হ্যাঁ, রবিন সোনার দাঁতটায় উল্লেখ করতেই সব বুঝে গেলাম। তাড়াতাড়ি ছুটে গেলাম মিউজিয়মে। মিস্টার মুচামারুকে সব খুলে বললাম, তারপর দু'জনে মিলে খুঁজে বের করলাম সোনার বেল্টটা...'

'কোন্ জায়গা থেকে?' কথার মাঝে প্রশ্ন করল মুসা।

'আসছি সে-কথায়। বেল্টটা কোমরে পরে চলে গেলাম বামনদের বোর্ডিং হাউসে। রত্নদানো সেজেছিল যে চারজন, তাদের নেতাকে ডেকে আনতে অসুবিধে হল না। গোল্ডেন বেল্ট আমি পেয়ে গেছি, সেকথা বললাম তাকে। জ্যাকেট তুলে এক পলক দেখলামও জিনিসটা। বললাম, চল্লিশ হাজার ডলার নগদ দিলে বেল্টটা তাকে দিয়ে দিতে পারি। টাকাটা কোথায় হাতবদল করতে হবে, সেকথাও বললাম। ইয়ার্ডের ঠিকানা দিয়ে বেরিয়ে এলাম বোর্ডিং হাউস থেকে।'

'তারমানে,' পরিচালক বললেন, 'তুমি ধরেই নিয়েছিলে, ওরা তোমার কাছ থেকে বেল্টটা ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করবেই।'

'হ্যাঁ। ওরা যদি টাকা নিয়েও আসত, তাহলেও কেস ওদের বিরুদ্ধে চলে যেত। এত টাকা ওরা পেল কোথায়, জানতে চাইত পুলিশ। বেল্ট চুরির কেসে না জড়ালেও তখন ডাকাতির কেসে ফেঁসে যেত ওরা।'

'রাস্তার পাশের ছেলেগুলো তাহলে ছেলে নয়!' বিড়বিড় করল রবিন। 'বামনরাই ছেলে সেজে আমার আর মুসার ওপর চোখ রেখেছিল।' বিরক্তি ঝরল তার কণ্ঠে। 'ওদেরকে জানাতে চেয়েছিলে, কোন্ পথে হেডকোয়ার্টারে ঢোকা সহজ হবে।'

'হ্যাঁ,' চেয়ারে সামান্য নড়েচড়ে বসল কিশোর। 'মিস্টার মুচামারুকে সব বুঝিয়ে বলেছি, কি করে কি করতে হবে। ঠিক সময়ে দলবল নিয়ে এসে ট্রেলারের আশেপাশে লুকিয়ে রইলেন চীফ ইয়ান ফ্লেচার। সঙ্গে মিস্টার মুচামারুও এলেন। বামনরা আক্রমণ করল আমাদের, ধরা পড়ল।

'একটা কথা বারবার এড়িয়ে যাচ্ছ তুমি,' হাসলেন চিত্র-পরিচালক। 'আমাদেরকে টেনশনে রাখার জন্যেই বুঝি? কোথায় লুকানো হয়েছিল গোল্ডেন বেল্ট?'

'যেখানে কেউ খুঁজবে না,' কিশোরও হাসল। 'মিস ভারনিয়ার বাড়িতে জানালায় উঠে ভয় দেখিয়েছিল রত্নদানো, ওরফে বামনেরা। কি করে? হিউম্যান-ল্যাডার, স্যার। একজনের কাঁধে আরেকজন উঠে একটা জ্যান্ত মই বানিয়ে ফেলত ওরা সহজেই...'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও,' হাত তুললেন পরিচালক। 'বোধহয় বুঝতে পারছি, কোথায় লুকানো ছিল গোল্ডেন বেল্ট।' ফাইলের পাতা উল্টে গেলেন দ্রুত হাতে। একটা রত্নদানো

জায়গায় এসে থামলেন, 'হ্যাঁ, এই যে, পেয়েছি। স্পষ্ট করে লিখেছে সব রবিন। মিউজিয়মের ছাত গম্বুজ আকৃতির, তারমানে দেয়াল গোল। দেয়ালের মাথায় খাঁজ, গম্বুজটা তার ওপর বসানো, অনেকটা ঢাকনার মত করে। ছবি ঝোলানর জন্যে ওরকম খাঁজ রাখা হয়েছে। ওই খাঁজেই লুকিয়ে রাখা হয়েছিল গোল্ডেন বেল্ট।'

'আমিও তাই ভেবেছিলাম, স্যার,' হাসছে কিশোর। 'কিন্তু মই লাগিয়ে উঠে দেখলাম, পিঠ-বাঁকা খাঁজ, ওখানে বেল্ট রাখার উপায় নেই, পড়ে যাবে।'

ভুরু কুঁচকে গেল চিত্র-পরিচালকের। সামান্য হাঁ হয়ে গেছে মুখ। শব্দ করে মুখ দিয়ে ফুসফুসের বাতাস বের করে দিলেন। 'তাহলে কোথায় ছিল বেল্টটা?'

'খাঁজে স্যাপ্টা জায়গা নেই,' বলল কিশোর। 'বোকা বনে গেলাম। কোথায় আছে গোল্ডেন বেল্ট, কিচ্ছু বুঝতে পারলাম না। ভাবছি, এই সময় গালে এসে লাগল ঠাণ্ডা হাওয়ার পরশ। চকিতে বুঝে গেলাম...'

'এয়ার কিণ্ডশনিং!' স্বভাব-বিরুদ্ধ কাজ করে বসলেন পরিচালক, উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠলেন।

'হ্যাঁ, স্যার, এয়ার কণ্ডিশনিং। বাতাস চলাচলের জন্যে সরু যে চ্যানেল করা হয়েছে, তারই একটার মুখের জালি খুলে নিয়েছে চোর, কালো সুতো দিয়ে জালির সঙ্গে বেল্টা বেঁধেছে। বেল্ট সুড়ঙ্গের ভেতরে ঝুলিয়ে দিয়ে আবার জায়গামত লাগিয়ে দিয়েছে জালিটা। ওখানে খুঁজতে যায়নি কেউ, কারণ মই ছাড়া ওখানে পৌঁছানো অসম্ভব। হিউম্যান-ল্যাডার বানিয়ে বামনেরা এই কাজ করেছে, কল্পনাও করতে পারেনি কেউ।'

'একসেলেন্ট, মাই বয়েজ!' উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে পরিচালকের চেহারা। 'ভারনিয়ার কাছে আমার মুখ রেখেছ তোমরা। থ্যাঙ্ক ইউ।'

'আমরা তাহলে আজ আসি, স্যার,' উঠে দাঁড়াল কিশোর। রবিন আর মুসাও উঠল।

'আরে বস, বস,' হাত তুললেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। 'আইসক্রীমের অর্ডার দিচ্ছি।' এত সুন্দর একটা কাহিনী নিয়ে এলে, আর খালি মুখে চলে যাবে?'

হাসি একান-ওকান হয়ে গেল মুসার। বন্ধুদের আগেই ধপ করে বসে পড়ল সে চেয়ারে।

'রত্নদানোর এই ছবিটায় শিগগিরই হাত দিতে চাই,' বললেন পরিচালক 'নাম কি রাখা যায়, বলত? ফোর লিট্‌ল্ নোমস হলে কেমন হয়?'

'চারটে খুদে রত্নদানো,' বিড়বিড় করল কিশোর বাংলায়। ইংরেজিতে বল 'লিটল নয়, স্যার, ডেভিল রাখুন। ফোর ডেভিল নোমস।'

'ঠিক, ঠিক বলেছ,' একমত হলেন পরিচালক।